রক্তগোলাপ

সৈয়দ শামসুল হক

সূচিপত্র

১. বছরের এ সময়ে বৃষ্টি.....2

২. সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে 36

১. বছরের এ সময়ে বৃষ্টি

বছরের এ সময়ে বৃষ্টি হয় কেউ কখনো শোনেনি। এ হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন আকাশটা প্রজাপতির পাখার মতো ফিনফিন করতে থাকে রোদ্দুরে, নীল রঙে; যখন উত্তর থেকে নতুন প্রেমের মতো গা-শির-শির-করা মিষ্টি বাতাস বয় কী বয় না তা বোঝাও যায় না; যখন লোকেরা খুব স্ফূর্তির মেজাজে থাকে আর বলাবলি করে সংসারে বেঁচে থাকাটা কিছু মন্দ নয়; আর ছেলেমেয়েরা কাঁচের জিনিসপত্তর ভাঙলেও যখন মায়েরা কিছু বলে না; যখন হাট বসতে থাকে বিকেলের অনেক আগে থেকেই আর ভাঙতে ভাঙতে অনেক রাত্তির হয়ে যায়, কারণ বছরের এ রকম সময়ে অনেক রাত্তিরেও মানুষ একা হয়ে যায় না, ভয়। করে না, নদীর খেয়া বন্ধ হয় না। এ রকম দিনে বৃষ্টি হয় বলে কেউ কখনো শোনেনি।

কিন্তু আজ কোথা থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে জমেছিল, ট্রেজারির পেটা ঘড়িতে চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। রাস্তার ওপর সবে আধখানা হাট বসেছিল, সবে গিন্নীরা পয়সা বার করে দিচ্ছিল কর্তাদের হাতে, সবে তেলেভাজাওলা তার উনুন জ্বালিয়েছিল, এমন সময় বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে দুহাত দূরেও কিছু আর দেখা গেল না। কেউ আর বাইরে রইল না। ডাকাত পড়ার মতো একটা শোরগোল পড়ে গেল; যে যেমন পারল রাস্তার দুপাশে জুতো কাপড় ট্রাঙ্কের দোকানের বারান্দায় ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল। এমনকি মসজিদের ভেতরটাও লোকে আর তাদের কাপড় থেকে চুঁইয়ে পড়া পানিতে গমগম সপসপ করতে

লাগল; মন খারাপ করে নিমিলিত নেত্রে বসে রইলেন ইমাম সাহেব; আলু পটল কুমড়োর বড় বড় ঝাঁকাগুলো পথের ওপরেই ভিজতে লাগল। একটা খেয়া এপারে এসেছিল বৃষ্টি মাথায় করে কিন্তু আর ফিরে যেতে পারল না। ক্যাশবাক্স গামছা দিয়ে ঢেকে ভিজতে লাগল ঘাটিয়াল। যাকে তাকে খামোকা গালাগাল দিতে লাগল সে। ওপারে ধু ধু পাড়ের ওপর কয়েকজন হাটুরে হতভম্ভ হয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে না পেরে যে যেদিকে পারল দৌড়ুল।

সে বৃষ্টি আর থামল না।

এক সময় বাতাসের এক প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল টাউন হলের মাথা থেকে কাঠের ফ্রেমে চটের ওপর সাটা বিরাট প্ল্যাকার্ডখানা। তাতে লেখা ছিল—

হৈহৈ কাণ্ড, রৈরৈ ব্যাপার, সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। আর্টিস্টকুলের যুবরাজ মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারি যাদুকরের শেষ প্রদর্শনী।

রূপসী মিস চম্পার অপূর্ব ক্রীড়া চাতুর্য।

নয়ন-মন সার্থক করুন।

আসুন, আসুন, আসুন।

প্ল্যাকার্ডের এক কোণে চিত্র ছিল প্রফেসর নাজিম পাশার হাসি ভরা পাগড়ি বাঁধা চেহারার। তার নিচে দুখানা হাড় ক্রশ করে রাখা। আরেকদিকে, একটা মেয়েকে গলা থেকে হাঁটু অবধি বাসে বন্ধ করে করাত দিয়ে দুখানা করা হচ্ছে, রক্ত পড়ছে। একেবারে নিচে আঁকা, কালো বোর্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো একটা মেয়ে, তাকে, ছোরা তুলে তাক করে আরেকজন। বসে বসে পোষা পায়রাগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন নাজিম পাশা, এমন সময় প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়ল। হাতের বাটি সরিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি– চম্পা, চম্পা।

টাউন হলের পেছনেই লাগোয়া দুটো ছোট কামরা আ সাজঘর। কামরা দুটোয় শহরের কর্তারা প্রাইভেট মিটিং করেন। আর সাজঘরটা কালে–ভদ্রে নাটক হলে ধুলো ঝেড়ে চামচিকে তাড়িয়ে ব্যবহার করা হয়। সাজঘরে বসে প্রফেসরের কোটের আস্তিনে লুকোনো পকেট নতুন করে টাকছিল চম্পা। কাল রাত্তিরের শো–এ বড় সাকরেদ জহির উইংসের আড়াল থেকে কালো সুতো–যেটা বাধা ছিল আস্তিনের এই গোপন পকেটে লাল রুমালের সঙ্গে—-টানতে গিয়ে মটমট করে সেলাই শুদ্ধ খসিয়ে এনেছিল; আরেকটু হলেই দর্শকের সামনে ফাস হয়ে যেতো জারিজুরি, ভাগ্যিস প্রফেসর টের পেয়ে তখনই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। চম্প সেলাই করতে করতে প্রথমে শুনল প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়বার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরের ডাক–চম্পা, চম্পা।

নিঃশব্দে এ ঘরে এসে চম্পা দেখল, প্রফেসর নাজিম পাশা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন—-কিন্তু বাতাসের, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পায়রাগুলো তার পায়ের কাছে ঘুরছে।

চম্পা অবাক হল না। একটু বিরক্ত হল।

বাবা যখন কাঁদেন, কোন শব্দ কবেন না, মনে মনে ভাবল সে। কেবল গোলগাল মোটা। শরীরটা একটু একটু কাঁপতে থাকে আর লাল হয়ে ওঠে চোখ, যেমন এখন কাঁপছে। তাকে কাঁদতে দেখে চম্পা অবাক হল না, কারণ, বাবা প্রায়ই কাঁদেন, রোজই কাঁদেন, একটা কিছু হলেই কাঁদেন–যা কেউ আশাও করবে না, বিশ্বাসও করবে না। প্রথম যেদিন বাবাকে কাঁদতে দেখেছিল, অবাক হয়েছিল চম্পা। সে তখন বছর নয়েকের। মা–কে তো সারাক্ষণ বকে বকে মাথা খারাপ করে রাখতেন বাবা; সেদিন চম্পা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে বাবার ম্যাজিক দেখাবার রঙিন লাঠিটা মা আমার সতীন, আমার সতীন বলতে বলতে বটি দিয়ে দুখানা করছেন, আর পশ্চয!–বাবা বারান্দায় বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন। সে বছরই বাবা তার নিজের দল করেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে চম্পা এসে দলের একজন। হল। সেই থেকে আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে। বাবা যখন স্টেজে গিয়ে দাঁড়ান, চোখ বাঁধা অবস্থায় কালো বোর্ডে অঙ্ক কষে ফেলেন, চম্পা যখন স্টেজে আসে, সবাইকে ঝুঁকে সালাম করে দুটো টুলের ওপর রাখা বাসের মধ্যে গিয়ে সেঁধোয় আর তার বাবা আর জহির করাত নিয়ে দুপাশে দাঁড়ায় তাকে জীবন্ত দুখণ্ড করবার জন্যে; টুপির ভেতর থেকে নাবা যখন পাঁচটা পায়রা বের করে উড়িয়ে দেন আর ওরা চা কারে হলের মধ্যে ঘুরতে থাকে, অচেনা অন্ধকার দেখে ডানা ঝাপটাতে

ঝাপটাতে আবার ফিরে আসে বাবার হাতেই, তখন প্রচণ্ড হাততালিতে হল ফেটে না পড়লে বাবার ভারি কষ্ট হয়। শশা ভাঙলে কোট পান্ট শুদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন, মিথ্যে করে বলেন, জ্বর এসেছে। চম্পা জানে, বাবা তখন কাঁদছেন। চম্পা বোঝাতে চেষ্টা করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আলোয়ানের ভেতর থেকে সবাই হাত বের করতে চায়নি, তালিটা তাই ফিকে হয়েছিল; কিংবা গায়ের লোক তো!–ব্যাপার দেখে চক্ষু চড়কগাছ, হাততালি দেবে কী! কিন্তু বাবা তা শুনবেন না। কাঁদবেন। এমনকি টিকেট কতো বিক্রি হল, তাও আব সেদিন খোঁজ নেবেন না; সেদিন জহির আর সামাদ ক্যাশবাক্স থেকে কম করে হলেও দুখানা দশ টাকার নোট সরাবে। চম্পা ও নিয়ে হৈচৈ করতে পারে না, বাবা শুনলে তাদের কিছু তো বলবেনই না, আবার দুহাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে নতুন করে কাঁদতে বসবেন।

একবার কী হল, জহির তাক করে ছোরা ছুঁড়তে জানে, লক্ষ্য ফসকায় না এক চুল। বাবা বললেন, তাহলে একটা বোর্ডে কাউকে দাঁড় করিয়ে জহির তার দিকে তাক করে ছোরা ছুঁড়বে–ছোরাগুলো চারপাশে চোখ–মুখ–গা ঘেঁষে বোর্ডে গিয়ে বিধবে। কিন্তু মুশকিল হল জহিরের ছোরার সামনে দলের কেউ বোর্ডে দাঁড়াতে সাহস পেল না। ব্যাপাটির চারজন যারা শহরে বাজনা বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, আবার শোর সময় টিকেট বিক্রি করে এসে ম্যাজিকের সঙ্গে বাজনা বাজায়, তাদের চারটে চমৎকার নাম দিয়েছিল চম্পা খাড়ানাক, বোচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। ছোরার কথা শুনে খাড়ানাক চাকরি ছেড়ে দেবার হুমকি দেখাল, বোচানাক ক্রমাগত ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, পটকা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, আর চালকুমড়ো গড়াতে গড়াতে গুম হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন একটা বুদ্ধি করলেন বাবা। খড় মাটি দিয়ে সুন্দর একটা কার্তিক বানিয়ে আনলেন কুমোরদের দোকান থেকে নগদ পনেরো টাকা দিয়ে। সেটাকে বোর্ডে দাঁড় করিয়ে জহিরের হাতে তিরিশটা ছোরা দিয়ে রিহার্সেল নেওয়া হল– দেখা গেল, চমৎকার তাক। একটাও মূর্তির গায়ে লাগেনি একেবারে গা ঘেঁষে বোর্ডে বিধছে। মূর্তিটা যখন সরিয়ে আনা হল, মনে হল, ছোরা গেঁথে গেঁথে কে যেন বোর্ডে আস্ত একটা মানুষের ড্রয়িং করে রেখেছে। এমনকি মূর্তির দুপায়ের মাঝখানে আধ ইঞ্চি ফাঁক– তার মধ্যেও তিনটে ছোরা বাঁট পর্যন্ত গাঁথা।

রিহার্সেল চলল কয়েকদিন। বায়না ছিল শান্তাহারে রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে। সেখানে স্টেজে নাবানো হল মূর্তিটাকে, জহির তাক করে চমৎকার ছুঁড়ে গেল একের পর এক তিরিশটা ছোরা। কিন্তু কেউ তালি দিল, উল্লাসে চিৎকার করে উঠল না। বরং শোনা গেল, লোকজন পটপট চেয়ারের হাতল ভাঙছে আর বলছে, মাটির মূর্তি দিয়ে ছোরার বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে! হতো জ্যান্ত মানুষ, বুঝতাম কেমন ম্যাজিশিয়ান। দুত্তোর, বাজে, বাজে! সে রাতে আর খেলা জমল না, সবাই হৈচৈ করে বেরিয়ে গেল, টিকেটের দাম ফেরতের জন্যে। মহা হট্টগোল বাধল, ওদিকে রেলের লোক এসে উনিশখানা চেয়ারের হাতল বাবদ দেড়শো টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসল, বাবা সাজঘরে ট্রাঙ্কের ওপর বসে কাঁদতে লাগলেন– এককোণে, অন্ধকারে।

পরদিন চম্পা এসে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে–মিস চম্পা–প্রাচ্যের সেরা রূপসী–যার অঙ্গুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুত স্তম্ভিত হয়। পরনে গলা থেকে পা পর্যন্ত সিল্কের আটো পোশাক। কোমর, নিতম্ব আর হাঁটুর প্রতিটি ভাঁজে যেন দাঁত কামড়ে বসেছে কাপড়,

ওপরে লাল সিল্কের তেমনি আঁটোসাটো খাটো কোর্তা, চক্রাকারে কাপড় সেলাই করে দুটো বুক চাঁদের মতো স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, মাথার চুল সাবান ঘষে ফোলানোপায়ে নীল সিল্কের জুতো। বাজনা বাজল, চম্পা এসে দাঁড়িয়েছে, জহির ছোরা তুলে তাক করল। বিদ্যুত নেচে উঠল চম্পার চোখে একপলকের জন্যে। জহিরকে কিন্তু সে কথা ভাববার সময় নেই। দুম্। চোখ না নাবিয়েও চম্পা বুঝতে পারল একটা ছোরা এসে ঠিক তার গালের পাশে গাঁথল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল চম্পার সারা হল এতো নিস্তব্ধ যে, সেটাই তার নিজের কানে শোনাল ঝড়ের মতো। দুম দুম দুম্। আর নিঃশ্বাস পড়ল না। সাতাশ-আঠাশ উনত্রিশ-ত্রিশ। সারা হল ফেটে পড়ল উল্লাসিত হাততালিতে। বোর্ড থেকে সরে এসে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করল চম্পা। জহির তার কোমর জড়িয়ে ধরে মাথা নুইয়ে আবার লম্বা এক সালাম করল। আবার হাততালি। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তখন চম্পার মনে হলো জহির ফিসফিস করে বলছে, মন বলছিল, তোকে জখম করে দিই চম্পা। তার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কিছু বলতে পারল না সে। জহির বলল, কিরে ভয় পেলি নাকি! ঠাট্টা করছিলাম।

কিন্তু চম্পার এতো করাও শুধু শুধু। বাবার কাঁদতে হলে কারণ লাগে না। একেক সময় তার মনে হয়, বাবার মতো শিশু দ্বিতীয়টি আর নেই। আবার এক সময়ে মনে হয়, ঐ কান্না তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক। মনে হয়, দল থেকে পালিয়ে যাই। ওপরের গ্যালারীতে বউ ঝিয়েরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এসে বসে ঘোমটা তুলে এ ওর হাত ধরে মাথা কাৎ করে তন্ময় হয়ে দেখে, কোলের ছেলেটা কাঁদলে তার মুখে মাই তুলে দিতে দিতে দেখে একের পর এর তাস উড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, কংকাল নাচতে নাচতে এসে জড়িয়ে ধরছে চম্পাকে, চুমো খেতে চাইছে আবার ভ্রূকুটি করতেই দূরে সরে যাচ্ছে।

চম্পা ভাবে, সেও যদি এ রকম ম্যাজিক দেখতে পারতো বিরাট বিস্ময় নিয়ে, কোলে থাকতে খোকা, পাশে বসে ননদ কাঁধ জড়িয়ে ধরত ভয়ে।

ছোবার সেই প্রথম শো-এর পর থেকে, আজ বছর দুই হবে, চম্পা একটু বিরক্তই হয় বাবাকে কাঁদতে দেখলে! এ এক অদ্ভুত কান্না। এক ফোঁটা পানি পড়ে না, একটু শব্দ হয় না। কাল রাত্তিরেও। কাল জহিরের দোষে আস্তিনের লুকোনো পকেট ছিঁড়ে গিয়ে খেলা প্রায় ফাঁস হয়ে যাবার যোগাড়, জোর সামলে নিলেন বাবা; কিন্তু শো শেষে কিসসু বললেন না জহিরকে, খেতে বসে ঠিক ঐ রকম শব্দহীন কান্না। বাবা যেন ভয় করেন, জহির চলে গেলে দল ভেঙে যাবে তার বাবা মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশা।

.

বৃষ্টিটা একটুও কমেনি। বরং বুঝি আরে; জোব হয়েছে। প্রফেসর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে। আছেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে শিশিরের মতো সাজ হয়ে পড়েছে তার দুহাতের পিঠে। চম্পার পায়ের শব্দে পায়রাগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। চম্পা একটু বিরক্তি নিয়েই ডাকাল, কী বাবা?

প্রফেসর চোখ তুলে তাকালেন। হাত আস্তে আস্তে নেবে এলো তার কোলের ওপর। দেখলেন, সন্ধ্যের শো-র জন্যে চম্পা মুখে রঙ মেখে একেবারে তৈরি। বাকি কেবল ড্রেস করে নেয়া। যে জানালা দিয়ে শোনা গিয়েছিল প্ল্যাকার্ড পড়ে যাবার শব্দ, সেদিকে অস্পষ্ট একটা হাতের ইঙ্গিত করে প্রফেসর বললেন, চম্পা, আজ বোধহয় শো হবে না।

তার কথায় সায় দিয়েই যেন কড় কড় দীর্ঘ একটা বিদ্যুত ডেকে উঠল দূরে দূর থেকে নিকটে।

এতো বিষ্টিতে কে আসবে?

দেখল, বাবার চোখ লাল টকটকে হয়ে গেছে শব্দহীন কান্নায়। হঠাৎ কেমন মায়া হল চম্পার। বলল, তুমি কি জানো, বিষ্টি যেতে কতোক্ষণ? তা ছাড়া আজ এদের হাট। মফঃস্বল থেকে অনেকে আমাদের দেখবে বলে এসেছে। যতো রাতই হোক আসবে।

আসবে?

চম্পা সেদিকে কান না দিয়ে বলল, বরং শো এক ঘণ্টা পিছিয়ে দাও। আর তুমি এক্ষুনি গিয়ে স্টেজ গুছিয়ে ফ্যাল, ড্রেস করে নাও। সময় কই?

তার কথায় যেন কাজ হল। উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ফাঁচ করলেন একবার। চম্পা বলল, তোমার কোটের আস্তিন হয়ে গেছে।

ভাল। তারপর চোরের মতো তাকিয়ে হঠাৎ শুধোলেন, প্ল্যাকার্ডটা পড়ে গেল শুনেছিস?

হ্যাঁ।

আর কিছু না বলে তখন সাজঘরের দিকে চলে গেলেন প্রফেসর। চম্পা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এতোক্ষণে তার চোখে পড়ল, পাশের দরোজটা খোলা। ওঘরে চৌকির ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে জহির। ঘুমোচ্ছে না, চোখ পিটপিট করে দেখছে চম্পাকে। আর তার পায়ের আঙুল মটকাচ্ছে সামাদ।

প্রফেসর চলে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল জহির। বলল, চম্পা, শোন।

কী?

এদিকে।

চম্পা এলে জহির হাসল। বিরক্ত হয়ে চম্পা শুধোল, কী বলবে?

যা বৃষ্টি, সব ভেসে যাবে নাকি, অ্যাঁ?

যাক।

একটু চা হয় না চম্পা?

বানিয়ে নাও গে। আমি জানি না।

খপ করে হাত ধরে ফেলল জহির। তার কী ইশারা ছিল, সামাদ কেটে পড়েছে।

চম্পা, তোকে পায়রা বানিয়ে রাখতে পারি, থাকবি?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চম্পা বলল, কোথায়?

আমার আস্তিনে।

বানাও দেখি কেমন ওস্তাদ!

চম্পার কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। কিন্তু জহির সেটা বুঝতে পারে না। সে মনে করে, চম্পার মনটাও আজ বৃষ্টিতে হু হু করছে তার মতো। বলে, তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করল চম্পা। সে জানে, এ রকম একটা সুযোগ হয় না। ঠোঁট তাই হাসিতে মাখা মাখা হয়ে ওঠে। জহির বলে, হাসছিস যে?

এমনি।

জহির চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকা চম্পার রূপ নিরিখ করে কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ লাফিয়ে ওঠে তার। সারা শরীরের মধ্যে শুধু ঐ হাসি-হাসি-ঠোঁট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

প্রায়-চিৎকার করে ওঠে সে। মুখটা নাবিয়ে এনেছিল, চম্পা তার নিচের ঠোঁটে আচমকা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। রক্ত পড়ছে। আর একটা চড়। খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা।

পায়রা! ইস, ওস্তাদ কতো? আয়না এনে দেবো, কেমন গাধার মতো দেখাচ্ছে?

স্টেজে নামবার জন্যে মুখে রঙ মেখেছিল চম্পা, তার খানিকটা লেগেছে জহিরের চিবুকে। তাই দেখে চম্পা লুটিয়ে পড়ল হাসিতে। হাসতে হাসতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল সাজঘরের দিকে।

.

কিন্তু বৃষ্টি কমবার কোন লক্ষণই নেই। আস্তে আস্তে সূর্য অস্তাচলে গেল। তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আরো ভয় করতে লাগল সবার। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীকে কোন এক অশরীরি শক্তি দুহাতে সংকুচিত করে শ্বাসরোধ করতে চাইছে। বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে তার দম্ভ, বৃষ্টিতে তার সংহারের সংকল্প, হঠাৎ নেমে আসা শীতের মধ্যে তার জয়ের উল্লাস লেখা।

হ্যাজাক দুটো ধরাল সামাদ। একটা সে রাখল স্টেজের ওপর, আরেকটা সাজঘর আর পাশের ঘরের মাঝখানে টুলের ওপরে, যেখানে বসে প্রফেসর একটু আগেই কাঁদছিলেন। হ্যাঁজাকের ফিনফিনে আলো থেকে ভ্রমরের মতো একটানা একটা গুঞ্জন সারা টাউন হলের ভেতরে ঘুরতে লাগল। প্রফেসর ড্রেস করে খামোকা পায়চারি করছেন খালি স্টেজে। চম্পা ড্রেস করেনি, সে একটা টুলের ওপর বসে অস্বচ্ছ চোখে বাবাকে দেখছে। আর জহির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের নিচে চম্পার দাঁতের দাগ পড়ছে একমনে। ছোট সাগরেদ সামাদ কী করবে বুঝতে না পেরে উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে আড়ালে। তার কোন কথা নেই, শো হোক আর না হোক, চম্পা জহিরকেই বিয়ে করুক আর হাতিকেই করুক, মাস কাবারে তার আশি টাকা পেলেই হল।

এমন সময় ভিজতে ভিজতে ব্যাপার্টির চারমূর্তি ভূতের মতো এসে হাজির খাড়ানাক, বোচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। তারা এসে মহা গম্ভীর হয়ে রইল, কাউকে কিছু বলল না। পটকা বারান্দার এককোণে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন করল খানিকটা; খাড়ানাক বসে বসে তার ড্রাম দুটো সেঁকতে লাগল সেই আগুনে। বৃষ্টির পানিতে একেবারে মিইয়ে গেছে। খোলটা। কিন্তু পরনের কাপড় ভিজে একসা সে-দিকে চোখ নেই। বোচানাক আর পটকা বসে বসে ভিজে হ্যাণ্ডবিলগুলো একটা আরে টার গা থেকে ছাড়াতে লাগল। আর চালকুমড়ো তার বিউগিল থেকে ঝাঁকিয়ে পানি বার করতে লাগল আর ক্ষণে ক্ষণে চোঙের মধ্যে চোখ লাগিয়ে পরখ করতে শুরু করল। এ যন্তর নিয়ে আবার ভারি মুশকিল। আগুনের আঁচ পেলে সোনালি কলাই উঠে তামা বেরিয়ে পড়বে।

চম্পা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। এক মুহূর্তে দেখল ওদের কাণ্ডকারখানা। বিশেষ কাউকে লক্ষ না করেই সে জানান দিল, কী রে?

আবার কী? হাটের দিকে যাবো, বৃষ্টি নাবলো। বলল খাড়ানাক। রাগটা তারই বেশি। কারণ ড্রামটা আঁচে ধরতে গিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল তাকে।

চম্পা বলল, এই পটকা, ওর সঙ্গে হাত লাগা না। নবাব হয়েছিস?

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ড্রাম নাবিয়ে চেঁচিয়ে উঠল খাড়ানাক, থাক, থাক, অমন কাজের কর্তা আমার দরকার নেই। চাই কী খোল শুদ্ধ দেবে পুড়িয়ে।

পটকা চম্পার ডাক শুনে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, আবার নিবিষ্ট মনে সে ভিজে হ্যাণ্ডবিল ছাড়াতে লাগল। হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। একটা টুল টেনে জুৎ করে বসল তার ওপর। বলল, সবগুলোর মেজাজ একেবারে ছিপ হয়ে আছে। হি হি হি।

চালকুমড়োর একটু বুদ্ধি কম। সে হাঁ করে ভাবল খানিক, পরে জিগ্যেস করল, ছিপ মানে?

মানে?– বলছি। বলেই চম্পা একটা সরু ভাঙা ডাল হাতে তুলে নিয়ে এক মাথা ধনুকের মতো টেনে শন করে ছেড়ে দিল, চটাং করে গিয়ে পড়ল চালকুমড়োর পিঠে। তিড়বিড় করে উঠল সে ব্যথায়।

চম্পা বলল, এর নাম ছিপ। বুঝলি? এই পটকা। পটকা?

জ্বি।

থাক আর হ্যাণ্ডবিল ছাড়িয়ে কাজ নেই। চাট্টি খিচুড়ি রাঁধবার জোগাড় দেখ গে। আজ আর শো হবে না। আড়মোড়া ভাঙল চম্পা, যেন কদ্দিন ঘুম হয় না তার, আজ একটু ঘুমোবে। চারকণ্ঠ একসঙ্গে শুধোল, কেন, শো হবে না কেন?

বোঁচানাক বলল, বারে, আমরা তো বিলি কাগজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমাদের দোষ কী! দূর গাধা। চম্পা পা দিয়ে বোচানাকের পেটে খোঁচা দিল একটা। দেখছিস না বৃষ্টি, লোক হবে কোত্থেকে?

ওস্তাদ বলেছে?

আমি বলছি। না বাপু আর পারি না। এই খাদা, এক কেলি পানি দে–না চায়ের। বসে বসে খাই। আর আমার বালিশের নিচে একখানা পাউরুটি আছে, আনবি?

চম্পার ঐ একটা স্বভাব। এই চারমূর্তির সঙ্গে বসলে কথার খই ফুটতে থাকে। এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেয় না কাউকে। আজ শো না হলে যে তাদের আসা যাওয়ার খরচই উঠবে না, খাবার পয়সা থাকবে না, সেটা যেন বেমালুম ভুলে গেছে চম্পা। সে

ভাবনা করছেন একা স্টেজে পায়চারি করতে করতে প্রফেসর নাজিম পাশা, বারো বছর আগে যিনি তাঁর ওস্তাদ প্রফেসর জে, সি, দত্ত হিন্দুস্থানে চলে যাবার পরে নিজের নাম নাজিমুদ্দি ভূঁইয়া থেকে নাজিম পাশা বানিয়ে দল করেছিলেন।

খাড়ানাক এসে খবর দিল, পাউরুটি বোধ হয় ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে, পাওয়া যাচ্ছে না।

ইঁদুরে না তুই? তারস্বরে জানতে চাইল চম্পা। বল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

জহির এসে বসল চম্পার গা ঘেঁসে আরেকটা টুল নিয়ে। বলল, থাক, আর রাগ করিস নি চম্পা। সিগারেট খাবি?

চম্পা তাকে কিছু বলল না, বলল খাড়ানাককে। যাক, আজ মাফ করে দিলাম। আর বলতে বলতে জহিরের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুজল। ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরল জহির। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চম্পা বলল, কী বাজে সিগারেট যে খাও। গন্ধে পেট মোচড়াতে থাকে। আরেকটা টান দিয়ে বলল, ঠাণ্ডাও নেহাত মন্দ পড়েনি।

তার সিগারেটের দুর্নাম শুনে জহির একটু মুখ শুকোল। রাগ ঝাড়ল পটকার ওপর। মাথায় তার চাটি মেরে বলল, হারামজাদা, চায়ের পানি বসাতে এতোক্ষণ?

চারমূর্তির মধ্যে পটকাই সবচে নিরীহ। কিন্তু তার চোখও জ্বলে উঠল জহিরের মার খেয়ে। অথচ মুখে কিছু বলল না, ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে চায়ের পানি আগুনে বসাল দুখানা ইট পেতে।

ঠিক তখন। একসঙ্গে চমকে মুখ ফিরিয়ে সবাই দেখে, বারান্দার নিচে তাদের পেছনে একটা মানুষ গাছের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে অন্ধকারে। নড়ছে না, শব্দ করছে না। বৃষ্টি আর অন্ধকারে ভাল করে ঠাহরও হচ্ছে না সত্যি সত্যি মানুষ, না আর কিছু।

কে? কে ওখানে? টুল থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিগ্যেস করল জহির। বৃষ্টির এই ঠাণ্ডার জন্যে কি-না কে জানে, তার কণ্ঠ বড় দুর্বল আর ভাঙা শোনাল। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল চম্পা।

লোকটা তখন আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই। কেউ তাকে চেনে না, এর আগে কখনো দেখেনি। ওরা ভাবল, এ শহরের কেউ হবে হয়তো থানার দারোগার জন্যে দশখানা পাশ চাই, কী কোন কর্তা পাঠিয়েছেন জানবার জন্যে যে চম্পা রাতে নেমন্তন্ন নিয়ে থাকে কি-না। বড় অস্বস্তি বোধ করল চম্পা। কিন্তু সে এক

মুহূর্তের জন্যে। সবার ভেতরে চম্পাই প্রথম বুঝতে পারল, ওরকম প্রস্তাব নিয়ে যারা আসে তারা দেখতে আলাদা, তাদের চলন অন্যরকম এ লোকটার পোশাক সাধারণ, কিন্তু কেমন সুন্দর গায়ে-মানানো, চেহারা কিছু না, কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না। শ্যাম বর্ণ

লম্বাটে মুখের মধ্যে সবকিছু হারানো খোয়ানোর স্থির একটা ছবি যেন। যেন, লোকটা সারাক্ষণ কী ভাবছে তার কোন সমাধান হচ্ছে না, তাই ভারি অন্যমনস্ক।

জহির একবার দ্বিধা করল–তুমি না আপনি? জিগ্যেস করল, কী চাই?

লোকটা এবারও কোন জবাব দিল না। তার মোটা পাজামা থেকে পানি নিংড়ে শার্টের খুঁট দিয়ে মুখ মুছল। বড় পরিতৃপ্ত দেখাল তাকে তখন।

ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি তখন থেকে থ। জহির কিছু বুঝতে না পেরে চম্পার কাঁধে হাত রাখল, চম্পা সেটা সরিয়ে দিল কাঁধ নামিয়ে–কিন্তু দুজনের কারো মন ছিল না তাতে। তারা দেখছে লোকটাকে। আর লোকটা তখন হাঁটু গেড়ে আগুনের পাশে বসে হাত সেঁকছে। একমনে।

আর সহ্য হল না জহিরের। এতোক্ষণ কথার জবাব না পেয়ে মেজাজ সপ্তমে ওঠবারই কথা। হয়তো একটা কিছু করতে যাচ্ছিল, তার আগেই চম্পা হাতের সিগারেটটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধোল, থাকো কোথায়?

লোকটা ফিরে তাকাল চম্পার দিকে। অস্পষ্ট একটা হাসিতে এক পলকের জন্যে মুখটা আলো হয়ে উঠল তার। এক হাতে বিশেষ কোন দিকে না দেখিয়ে, যার মানে যে–কোন দিকে হতে পারে, বলল, ওদিকে। তার কণ্ঠ শোনান অদ্ভুত, যেন অনেক দূর থেকে

ভেসে আসা একটা গম্ভীর ঘে। সে কণ্ঠ সবাইকে অবশ করে দিয়ে গেল। বিশেষ করে জহিরকে।

লোকটা চম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, বিষ্টিটা এখুনি যাবে। আমি দেখে এসেছি, ওদিকে আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে বলতে কোন দিক বোঝাল কে জানে। হঠাৎ সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, এ-কী! তারা দেখা যাচ্ছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই- একেবারে ছবির মতো।

আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল চম্পা। লোকটা তখন একমনে তার জামা শুকোচ্ছে আগুনে। কী একটা বলতে গেল চম্পা, পারল না। লোকটা এমন তন্ময় হয়ে আছে যে সাহস হলো না।

তাকে সম্ভ্রম করে পটকাও কেৎলিটা নাবিয়ে নিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তার পানিও গরম হয়ে গিয়েছিল; সে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল চা বানাতে। আর বৃষ্টি থেমেছে দেখে জহির তাড়াতাড়ি দৌঁড়ুল সাজঘরের দিকে।

সেখানে গিয়ে প্রফেসরকে সে পেল না। স্টেজে উঁকি দিয়ে দেখে সেখানে তিনি একটা চেয়ারে বসে আছেন, পা দোলাচ্ছেন। তাকে গিয়ে বলল, বিষ্টি তো নেই!

নেই মানে?

ধরে গেছে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। জহিরকে ধমক দিয়ে বললেন, তা হ্যাঁ করে আমার চেহারা দেখছো কী? সামাদ কই, ব্যাণ্ডপার্টি গেল কোন চুলোয়? বাজনা বাজাক, টিকিট ঘরটা খুলে দিচ্ছে না কেন? আমি মরে গেছি নাকি, বলে কী এরা, চম্পা–চম্পা।

আবার সেই ডাক। কিন্তু এ ডাক শুনতে পেল না সে এবার। সে তখন কথা জুড়ে দিয়েছে সেই লোকটার সঙ্গে, পটকা চা এনে দিয়েছে, চুমুক দিতে দিতে।

কী নাম?

আল্লারাখা।

হি হি হি।

আল্লারাখা তখন খাড়ানাকের সঙ্গে ড্রামটা আগুনের ওপর ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গরম করছে। চম্পাকে হাসতে শুনে এক পলক চোখ তুলেই নাবিয়ে নিল। তারপর নিচু গলায়

কৈফিয়ত দিল, আমার সব ভাইবোনগুলো হতো আর মরে যেতো। তাই সবশেষে আমি যখন হলাম, মা নাম রাখলেন আল্লারাখা। আমি কী করব?

হি হি। বাহ নিজের নাম কেউ বদলাতে পারে না নাকি? আমার বাবাও নাম বদলেছে। তুমি বদলাবে?

লোকটা খুব উৎসাহী হয়ে উঠল। চম্পার দিকে হঠাৎ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধোল, আমাকে তোমরা নেবে?

নেবো মানে? হকচকিয়ে গেল চম্পা।

দলে।

না বাপু, আমাদের লোক দরকার নেই।

তাহলে নাম বদলে কী হবে?

তখন প্রফেসরের পেছনে এলো জহির। দেখেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

এ লোকটা আছে এখনো? আঁ? চম্পা, এতো হাসি কিসের?

প্রফেসর কিছু বুঝতে না পেরে একবার চম্পার দিকে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন। আরো খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা।

বাবা, বলে নাম আল্লারাখা। হি হি হি।

লোকটা আগুনের ওপর ড্রামটা ধরে রেখে আড়চোখে দেখছিল চম্পাকে, তার কপালের ওপর আধখানা চাঁদের মতো দুলতে থাকা একগুচ্ছ চুল। আর ভাবছিল, সে পারতো, সে এক্ষুনি অবাক করে দিতে পারতো চম্পাকে, যদি চম্পার ঐ চুলের চাঁদ সে একটুখানি স্পর্শ করতে পারতো।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছিল চম্পার কপালে সেই চুলের গুচ্ছ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বুঝি আল্লারাখা। হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। হাত থেকে ড্রামটা পড়ে গেল গনগনে আগুনে। ভাল করে বোঝার আগেই পটাস করে একটা শব্দ হল খোল ফেটে যাওয়ার, তারপর উঠতে লাগল চামড়া পোড়ার কটু গন্ধ।

হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। বেওকুফের মতো উঠে দাঁড়াল আল্লারাখা। খাড়ানাক আর চালকুমড়ো ড্রামটাকে কোনরকমে তুলে বারান্দার নিচে বৃষ্টির জমা পানিতে ছুঁড়ে ফেলল।

ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লারাখার কলার চেপে ধরল জহির। তোকে ড্রাম ধরতে বলেছিল কে। বলেই এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল সে, যার টাল সামলাতে অনেকক্ষণ লাগল আল্লারাখার।

প্রফেসর বললেন, চম্পা, আমি বুঝতে পারছি না আমার ওপর এতো গজব কেন?

কী হয়েছিল, চম্পা থরথর করে কাঁপছিল। প্রফেসর তাকেই ধমকাতে লাগলেন, এখন ড্রামটাও পুড়ল। এইটার দাম কতো জানিন? আমাকে কাটলেও দশটা ফালতু টাকা বেরোবে না। কোত্থেকে এ উজবুক এলোরে? চম্পা?

পানিতে চুবিয়ে ড্রামটা আবার বারান্দায় তুলে এনেছে খাড়ানাক আর চালকুমড়ো। গোলমাল শুনে সামাদ, পটকা আর বোচানাকও ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সামাদ বলে উঠল, ব্যাটা মিচকে যেন কিছু জানে না। বোবা নাকি?

আল্লারাখা ড্রামটার দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর চম্পা আর প্রফেসরকে বলল, ফ্রেমটা বেঁচে গেছে। একটা খোল পেলে আমি ছেয়ে দিতে পারতাম। আশেপাশে সে তাকাল, যেন এখানেই কোথাও এক আধটা খোল পাওয়া যাবে।

হুংকার দিয়ে উঠল জহির, ছেয়ে দিতে পারতাম! শুয়ার কা বাচ্চা। তোর পিঠ থেকে চামড়া তুলে আমি খোল বানাবো আজ।

একটা কিছু নেই এখানে? আল্লারাখা বিড়বিড় করে বলল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারল না।

প্রফেসর ড্রামের কাছে উবু হয়ে বসে হাত বুলোতে লাগলেন পোড়া খোলর ওপর, যেন এক্ষুনি তিনি যাদুবলে ভাল করে দিতে পারবেন। মন্ত্র পড়ার মতো তিনি বলে চললেন, আমার কাছে বলে একটা পয়সা টাকার সমান। এটাকে ঢোকাল কে এখানে? কোত্থেকে এলোরে গরুটা। আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেলরে চম্পা।

এতোক্ষণে চম্পার মনে পড়ল কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল তখন থেকে সুড়সুড় করছে। সেটাকে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে তার চোখে চোখ পড়ল আল্লারাখার। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চম্পার দিকে।

আবার মেয়েছেলের দিকে চোখ! জহির ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল আল্লারাখার গালে।

যেন আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। চোখের ওপর থেকে চম্পার চেহারা মুছে গেল। আল্লারাখা ঘুরে পড়তে পড়তে কাঠের মোটা থামের সঙ্গে মাথা ঠুকে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল কপালের বাঁ দিক টোম্যাটোর মতো।

প্রফেসর আর্তনাদ করে উঠলেন, চম্পা, ওকে মারিস নে। মরে যাবে যে। আবার সেই শব্দহীন কান্না।

চম্পা বিরক্ত হয়ে বলল, আমি কোথায় মারছি!

আল্লারাখা একবার আকুল হয়ে প্রফেসরকে দেখবার চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে। কিন্তু ভয় করল আবার যদি চম্পার দিকে চোখ পড়ে তার। পটকা আর বোচানাক তাকে টেনে তুলল পায়ের ওপর। কপালটা দেখে দুজনে দাঁত বার করে বলল, মাথা ফাটেনি ওস্তাদ। অ্যাকটিং করছে।

জহির তখন গজরাচ্ছে, মারবে না, শালাকে সোহাগ করবে।

জহিরের মুখের কথা মাটিতেও পড়তে পায়নি, এমন সময় বাইরে একটা প্রচণ্ড হৈচৈ ফেটে পড়ল। অনেকগুলো তোক একসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে আর টাউন হলের টিনের বেড়ায় পড়ছে দমাদম ইট-পাটকেল। আল্লারাখার হাত ছেড়ে দিয়ে পটকা কানখাড়া করে বলল, কী যেন শুনছি? ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেল।

ভয় পাবার কথাই। শখানেক লোক কোত্থেকে একসঙ্গে হয়েছে, অন্ধকারে তাদের ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাটা ভরে গেছে, শুধু চিৎকার শোনা যাচ্ছে আর ইট-পাটকেল। ভেঙে পড়া প্ল্যাকার্ডটার ওপর কয়েকজন বেদম নাচছে আর লাথি মারছে। আবার কেউ আমলকি গাছ বেয়ে উঠে গেছে ওপরে, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল হলের ছাদের ওপর। বিকট একটা শব্দ হল।

বেরিয়ে আয় ম্যাজিকের বাচ্চা। বেরিয়ে আয়। ঘুড়িটা গেল কোথায়? কোন ভাগাড়ে মরল সব? চালাকির জায়গা পাওনি বদমাশ!-এই রকম সব হাঁকডাক চলছে। কেউ আবার চিৎকার করে উঠছে, নাজিম পাশা-সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছে সবাই ধ্বংস হোক।

আরেকবার একজন হাক দিল কুড়িগ্রাম– আবার সমবেত চিৎকার ছাড়তে হবে। কে যেন এরিমধ্যে ফোড়ন কাটল, যাদু মেরে হাওয়া হয়ে গেল নাকি বাপ! অমনি দুপ-দাপ পড়তে লাগল ইট। ছাদে যে লোকটা লাফিয়ে পড়েছিল সে উপুড় হয়ে কঁকিয়ে উঠল, আমি ভাই আমি। একটা ঢিল এসে লেগেছে তার। কিন্তু তার কণ্ঠ কেউ শুনতেই পেল না।

জহির উঁকি মেরে ব্যাপার দেখেই ছুট দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রফেসরকে গিয়ে খবর বলল, পাবলিক খেপেছে।

হ্যাঁই! পাবলিক খেপেছে? কেন?

কী জানি!

প্রফেসর তিরিশ বছর ধরে ম্যাজিক দেখিয়ে খাচ্ছেন। লোকের নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু তিনিও যেন ঘাবড়ে গেলেন আজ। কারণ, কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি কেন ওরা খেপতে পারে। কাল রাতের শো–তো চমৎকার গেছে। আর আজ শো হলই বা কোথায় যে ওরা খেপবে? বেওকুফের মতো তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দলের সবার দিকে।

চম্পা বলল, জহির তুমি একবার যাও না, দেখে এসো কী ব্যাপার।

প্রফেসর যেন এই সোজা কথাটাই এতোক্ষণ মাথা থেকে বার করতে পারছিলেন না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ চম্পা, ও যাক, দেখে আসুক।

দড়াম করে একটা ইট এসে পায়ের কাছে দশ টুকরো হয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি নিমেষে অন্তর্হিত হল ঘরের মধ্যে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর চম্পার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, চম্পা, শিগগীর ঘরে যা, খিল দে। পরমুহূর্তেই ফাঁকা হয় গেল বারান্দা।

একা আল্লারাখা দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, কেউ তাকে লক্ষও করল না। বাইরে যে এভোবড় একটা গোলমাল চলছে তার যেন কোন প্রতিক্রিয়াই নেই আল্লারাখার মুখে। সে নিঃশব্দে তার ডান হাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে তুলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

বাইরে একজন হঠাৎ হৈহৈ করে উঠল, ঐ যে ঐ বেরিয়েছে।

সবাই তখন চোখ তুলে দেখে দোতলার বারান্দায় এক মূর্তি; জহির এসে দাঁড়িয়েছে ওপরতলায় মেয়েদের গ্যালারির পাশে ছোট্ট ঝোলানো বারান্দায়। ক্ষীণকণ্ঠে সে দুহাত তুলে বলল, শান্ত হোন ভাইসব! ভাইসব, আপনারা শান্ত হোন।

সবাই একটু চুপ করল। এক মুহূর্তের জন্যে। কে একজন বলল, আরে, এটা তো সাকরেদটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

সাহস থাকে, তোর ওস্তাদকে বেরিয়ে আসতে বল।

মার, মার শালাকে।

আবার উড়তে লাগল থান ইট! জহির কোনরকমে দৌড়ে পালাতে গিয়ে অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নষ্ট করবার মতো সময় নেই। তক্ষুনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গ্যালারির দরোজাটা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগল সে।

সাজঘরে প্রফেসর চম্পাকে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। এ শহরে কি পুলিশ নেই? আইন নেই? তার মনে হচ্ছিল যেন এ যান বাচলেও বিশ্বাস হবে না, বেঁচেছেন। চম্পাকে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে নাকি? ভরসা কী! যোয়ান মেয়েছেলে, তার ওপর শো এর মেয়ে, কোন কর্তার চোখ পড়েছে আল্লা জানে। প্রফেসর বিড়বিড় করে চম্পাকে বললেন, ভয় করিস না চম্পা। ভয় করিস না। দরজা বন্ধ আছে।

কিন্তু চম্পারও ততোক্ষণে ভয় করতে শুরু করেছে। ছাদের ওপর পর পর দুটো ইট এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ল বাপ মার মেয়ে।

কোলাহল শুনে মনে হল, ওরা এবার হলের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে নাজিম পাশা– ধ্বংস হোক। এমনকি স্টেজের ওপরেও দুপদাপ শুরু হয়ে গেছে। চড়চড় করে পর্দাটা ছিঁড়ে পড়ল বুঝি।

হঠাৎ সব চুপ। বিশ্বাস হল না প্রফেসরের। ভাবলেন, তাঁর কান খারাপ হয়ে গেল নাকি? চম্পার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, চম্পাও অবাক হয়ে মাথা তুলেছে।

সত্যি, একেবারে নিঃশব্দ। পিন পড়লেও শোনা যাবে। কী ব্যাপার? থেমে গেল কেন সব? পুলিশ?

গ্যালারির নিচে লুকিয়ে ছিল জহির, সেও হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি ঘরের খিল খুলে উঁকি দিল।

সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর আর চম্পা।

তারা সবাই দেখল, স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আল্লারাখা। আর জনতা সারা হলে যে যেখানে ছিল স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আছে। হ্যাঁজাকে তেল পোড়ার সুমসুম শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

প্রফেসর কি স্বপ্ন দেখছেন?

চম্পার কপালের ওপর চাঁদের মতো আবার সেই একগুচ্ছ চুল লাফিয়ে পড়ল।

বিস্ময়ে চোয়াল স্কুলে পড়ল জহিরের।

আল্লারাখা এক হাত তুলল, সময় নিয়ে সবার চোখ বুলিয়ে আনল, তারপর সেই মেঘের মতো কণ্ঠ ধ্বনিত হল সারা হলে।

দেখুন, এটা আপনাদের নিজেদের ক্ষতি। নিজেদের টাউন হল নিজেরাই ভাঙছেন, আপনাদের যা বলবার আছে বলুন, হৈচৈ করবেন না।

কেউ কোন উত্তর দিল না।

বলুন।

কেউ নড়ল না। যেন কারো আর একফোঁটা শক্তি নেই মনে কিংবা শরীরে। এমনকি অনেককে লজ্জিত দেখাল, বিব্রত মনে হল।

তাহলে আপনাদের কিছু বলবার নেই? আল্লারাখার গম্ভীর কণ্ঠ আবার বৃথাই ঘুরে বেড়াল সারা হলে। তখন সে স্টেজ থেকে চলে যাবার জন্যে মুখ ফেরাল।

জনতার একজন হঠাৎ কথা বলে উঠল। থামল আল্লারাখা।

বিষ্টিতে আমাদের জিনিশপত্র সব ভেসে গেছে। নৌকাডুবিতে মরেছে তেরোজন। মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে।

তখন আরেকজন যোগ দিল, শুনছি, রেল লাইন ডুবে গেছে, আজ আর ট্রেন আসবে না।

হাটে যারা দোকান দিয়েছিল, সব ভেসে গেছে রাস্তার ফকির হয়ে গেছে বড় বড় ব্যাপারীরা।

এবার কয়েকজন একসঙ্গে বলল, এ মওসুমে কোনদিন এমন বিষ্টি হয় না।

আল্লারাখা সবার কথা শুনল। এক বুড়ো এবার ভিড় ঠেলে কাছে এলো তার। চোখে বোধহয়। ভাল দেখতে পায় না। চোখ পিটপিট করে সে বলল, এ বিষ্টি তো আসবার কথা না বাবা। যাদুতে কী না হয়? এ যাদুর কীর্তি। তোমাদের কীর্তি। আমি বাবা অনেক দেখেছি। কাল তোমরা এসেছ, আর অমনি ঝড় তুফান।

সবাই হৈহৈ করে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সব যাদু চলবে না। টাকা দিয়ে যেতে হবে। কই হে, কার কতো বলো।

ভিড় হঠাৎ এগিয়ে আসছিল, আল্লারাখা হাত তুলতে সবাই থেমে গেল। উইংসের আড়াল থেকে চম্পা ফিসফিস করে বলল, বাবা, লোকটার কথা ওরা এতো শুনছে কেন? কী জানি। বোধহয় কিছু জানে?

প্রফেসর আর চম্পার দৃষ্টি বিনিময় হল, যার অর্থ একমাত্র যাদুকরেরাই বোঝে।

আল্লারাখা তখন বলে চলেছে, শুনুন, বিষ্টি এনে প্রফেসর নাজিম পাশার কোন লাভ নেই। বরং বিষ্টি হলে তার শো হবে না। বিষ্টি দেখে তিনি নিজেও খুব মন খারাপ করেছিলেন। তারই তো ক্ষতি। আজ হাটের দিন, আজ অনেক দূর থেকে সবাই আপনারা আসবেন, বিষ্টি এনে নিজের শো নষ্ট করে তার কী লাভ?

এ কথার জবাব কেউ দিতে পারল না। এবারে সবাইকে উসখুস করতে দেখা গেল বেরিয়ে যাবার জন্যে। মাথা নিচু করে ফেলেছে জনতা। যে বুড়োটা স্টেজের কাছে এসেছিল সে আমতা আমতা করতে লাগল।

আপনারা বলছিলেন প্রফেসর নাজিম পাশা লুকিয়ে আছেন। মিথ্যে। তিনি আপনাদের সামনেই আছেন। দেখুন।

আল্লারাখা থামবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্টেজে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তার পেছনে চম্পা। চম্পার পর জহির, সামাদ, ব্যাপার্টির চারমূর্তি। জনতা হাততালি দিয়ে

উঠল একসঙ্গে। হাসিতে ঝলমল করে উঠল প্রত্যেকের মুখ। তরঙ্গের মতো উঠতে পড়তে লাগল হাততালির শব্দ। উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠল টাউন হল।

দেখুন, এটা কী?

গোলাপ। শখানেক কণ্ঠ উত্তর দিল একসঙ্গে।

আল্লারাখার হাতে একটা গোলাপ। লাল, তার ভারি সুগন্ধ, বিরাট। এক মুহূর্ত আগে গোলাপটা কোথাও ছিল না, সে একবারও হাত পকেটে ঢোকায়নি, তবু কোত্থেকে তার হাতে এলো কেউ ভাবল না। যেন সারাক্ষণই ওটা তার সঙ্গে ছিল। তখন আল্লারাখা চম্পার কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া আধখা চঁড়ের মতো চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করল– আরেকটা গোলাপ বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

হাততালি দিয়ে উঠল জনতা। এবারে আরো প্রবল। চমকে উঠল চম্পা। এ–কী? তার সারা শরীর এক নিমেষে গোলাপের সুবাসে ভরে উঠেছে। বিস্ময় নিয়ে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আল্লারাখার দিকে।

আল্লারাখা তখন প্রফেসরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর একবার বিব্রত হয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন। সে বলল, আপনার কাছেও অনেক গোলাপ আছে! দিন এরা অনেক দূর থেকে এসেছে। খুশি হবে। তবেই তো ওরা জানবে, আপনি ওদের ভাল চান। প্রফেসর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলেন। তার পকেটে গোলাপ আসবে কোত্থেকে?

তখন আল্লারাখা মাফ করবেন বলে প্রফেসরের পকেটে হাত ঢোকাল, বের করে আনল একমুঠো গোলাপ। রক্তের মতো টকটকে লাল, তাজা, যেন এইমাত্র বাগান থেকে তুলে আনা হয়েছে। সুগন্ধে ভরে গেল সারা স্টেজ। চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল আল্লারাখার মুখ।

হঠাৎ লোকটা যেন খ্যাপা হয়ে গেলে। পাগলের মতো যেখানে হাত দিল সেখান থেকেই বেরুল গোলাপ। সে ছুঁড়ে দিতে লাগল গোলাপ জনতার মধ্যে। একশ, দুই শ, তিন শ, শত শত। তার আর শেষ নেই। চেয়ার, টুল, দরোজা, চুল, কান, আস্তিন, মেঝে– সারা হল থেকে বেরুচ্ছে গোলাপ। জনতার মধ্যে নেমে এসে সবার শরীর স্পর্শ করছে আল্লারাখা, আর বেরিয়ে আসছে গোলাপ। সবার হাত ভরে গেল, পকেট উপচে উঠল, সারা হল সুগন্ধে মম করতে লাগল– তবু শেষ হল না। বিদ্যুৎগতিতে চলছে আল্লারাখার দশ আঙুল, যেন এক সঙ্গে অনেকগুলো পাখির ডানা ঝটপট করছে আর তা থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে রক্তগোলাপ।

২. সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে

সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে লোকেরা বলাবলি করল দুহাজার। অনেকে বলল, কম করে হলেও চার হাজার গোলাপ। তারা বাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দশ হাজারে। সারা রাত ধরে চলল তাদের মধ্যে এই আলোচনা। গর্বের সঙ্গে প্রত্যেকে দেখল তাদের বাড়ি নিয়ে আসা একেকটা গোলাপ। দশ হাজার গোলাপ তারা দেখে এসেছে। কিন্তু একমাত্র আল্লারাখা ছাড়া আর কেউ জানে না, আসলে সে মাত্র সাতশ ছিয়াশিটা গোলাপ এনেছিল।

লোকেরা কেউ একটা দুটো পাঁচটা যে যেমন পেরেছে গোলাপ নিয়ে এসেছে বাড়িতে তাদের বউকে ছেলেমেয়েকে পড়শিকে দেখাবে বলে। কিন্তু সবাই ভাগ্যবান নয়, সবাই আনতে পারেনি। কেবল যারা প্রথম এসেছিল তারাই পেয়েছে। বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল গোলাপের খবর সারা শহরে, আর দলে দলে লোক চারদিক থেকে এসে ভিড় করেছিল টাউন হলের দরোজায়। সে রাতে প্রফেসর নাজিম পাশাকে দুটো শো করতে হয়েছিল। একেকটা শো ছিল লোকে লোকারণ্য, কতো লোক প্যাসেজে, পেছনে, দরোজায় দরোজায়। দাঁড়িয়ে থেকে খেলা দেখে গেছে। ক্যাশ বাকশ ভরে উঠেছে পয়সায়, চম্পাকে দুবার এসে ট্রাঙ্ক খুলে ক্যাশ বাঁশ ঢেলে খালি করতে হয়েছে। টিকেট ইসু করতে করতে সামাদ আর পটকার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। সবাই গো ধরেছে– আমরাও গোলাপ চাই।

কিন্তু আল্লারাখা জানে একদিনে সাতশ ছিয়াশিটার বেশি গোলাপ সে বের করতে পারবে না। স্বপ্ন, বাস্তব, মায়া, বিভ্রম, বস্তু সব কিছুরই একটা সীমারেখা কোথাও না কোথাও আছে। আল্লারাখা বলল, কাল সে আবার গোলাপ দেবে সবাইকে।

লোকেরা তখন চেপে ধরল, কাল শো করতে হবে প্রফেসরকে। কথামতো আজকেই ছিল এ শহরে তাঁর শেষ প্রদর্শনী, কিন্তু তিনি রাজি হয়ে গেলেন। প্রফেসর দত্ত-র দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজে দল করে অবধি একরাতে এতো টাকার টিকেট বিক্রি আর কখনো হয়নি। এবার ইসলামপুরে রহমান দর্জির সুট কাটা বাবদ মজুরি তিনি শোধ করতে পারবেন, জিনিসপত্র বানিয়ে আরো কয়েকটা নতুন আইটেম ঢোকাতে পারবেন শো-এ। চম্পাকে আসল সোনার গয়না বানিয়ে দিতে পারবেন। আজকাল সিনেমার পাল্লায় পড়ে ম্যাজিকের মজা কমে গেছে লোকের কাছে। কিন্তু আজকের কাণ্ড দেখলে কে বলবে সে। কথা? জনতাই দাবি করছে অতিরিক্ত শো-এর, হলে লোকের কুলান হচ্ছে না, দূর দূর গাঁ থেকে মানুষ পিঁপড়ের মতো আসতে শুরু করছে। আল্লারাখা স্টেজে দাঁড়িয়ে বলল, কাল। আবার সবাইকে গোলাপ দেবে সে। লোকেরা শুনে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

জহির নাক কুঁচকে বলল, মেসমেরিজম! সব মেসমেরিজম! এর আবার কেরামতি কী? ছোঃ।

চম্পা পাল্টা আক্রমণ করল, তো হয়েছে কী? হলই বা মেসমেরিজম।

জহির তার ঠোঁটে কামড়ের জ্বালাটা ভুলতে পারেনি তখনো, তার ওপরে চম্পার আল্লারাখার দিকে টেনে কথা বলা! থুক করে সে থুতু ফেলে বলল, তুই তো বলবিই। তোর বাপের টাকে পয়সা উঠছে কি-না! বাপের ব্যাটা হয় হাতের গুণে হয়কে নয় করুক, বুঝি তা হলে। মেসমেরিজম করে কারদানি। ও করলে আমিও এক্ষুনি ধানের ক্ষেতে জাহাজ চালাতে পারি।

চালাও না দেখি! চম্পা বিদ্রূপ করে বলল।

তোর কথায় আর কী! ওস্তাদের নিষেধ আছে। বাহাদুর হওতো নিজের দুখানা হাত দিয়ে খেল দেখাও। মেসমেরিজম তো ছোট জাতের কারবার। বাপ বেটিতে তাই দেখেই চিত্তির! কথা বলার ধরন দেখে হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। বুঝল, খুব হিংসে হয়েছে জহিরের। একটা কিছু যে তাকে কাবু করতে পেরেছে এইটে মনে করে চম্পার ভেতরটা খুশিতে লাফিয়ে উঠল। তাকে খানিকটা খোঁচাতে, খানিকটা মজা করতে হাত বাড়িয়ে বলল, বুঝলাম। একটা সিগারেট দেখি এবার।

গরগর করতে করতে জহির সিগারেট বার করে দিল! এ রকম আকস্মিক মোড় নেবে কথার, তা সে ভাবতে পারেনি। কেমন আমতা আমতা করতে লাগল। নিজের ওপরেই রাগ হল ভীষণ। তার ওপর ঠোঁটের নিচে দাঁতের দাগ এখনো কালো হয়ে আছে।

আগুন নেভাতে গিয়ে চম্পাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল সে আচমকা। চম্পা নিচু গলায় গর্জন করে উঠল, ছাড়ো। কিন্তু ছাড়ল না জহির। তারা দাঁড়িয়েছিল স্টেজের পেছনে

ঝোলান কালো পর্দার নিচে। সেখানে অন্ধকারে দুম করে একটা শব্দ হল শুধু। কাঠের পাটাতনের ওপর ভারি দুটো শরীর পড়ে যাওয়ার শব্দ। হির তাকে বুকে চেপে ধরে গড়াতে গড়াতে কালো পর্দার ধুলো-ভর্তি ভ্যাপসা-গন্ধ ভাজের নিচে সেঁদিয়ে গেল। চম্পার মনে হচ্ছিল পাজর কখানা যেন গুঁড়িয়ে যাবে।

ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

চুপ।

তার মুখ চেপে ধরল জহির। তারপর একটা মাত্র অস্বস্তিকর মুহূর্ত। চম্পার সমস্ত শরীর যেন অবশ আর অচেনা হয়ে গেলে সেই মুহূর্তে। সারা শহর আজ বিকেলের হঠাৎ বৃষ্টিতে যেমন হয়ে গিয়েছিল, অবিকল তেমনি। একবার শুধু জহির দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, দ্যাখ, কাকে বলে মেসমেরিজম! চম্পা, তুই আমার বউ হবি?

চম্পা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল আল্লারাখা প্রফেসরের সমুখে নতমুখে বসে আছে। ব্যাপার্টির চারমূর্তি রান্না করতে লেগে গেছে। আর ছোট সাকরেদ সামাদ বসে বসে জিনিসের লিস্টি মেলাচ্ছে। প্রতি শো-এর পর ওর হচ্ছে এই কাজ। তার কাছে গিয়ে বসল চম্পা। বলল, দে আমাকে, আমি দেখছি।

সামাদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, শুনলাম, ঐ লোকটাকে দলে নেয়া হলো।

কে?

ঐ যে গোলাপ। ওস্তাদ বলতেই রাজি হয়ে গেল। দল ভাঙাতে এসেছে কি-না বুঝতে পারলাম না।

কেন?

ফটু করে রাজি হয়ে গেল কি-না। অনেকে ওরকম খেলা শিখে নিয়ে শেষে বারোটা বাজায়। নিজে দল করে। কাজটা বোধহয় ভাল করলেন না ওস্তাদ।

কিন্তু চম্পা একটুও অবাক হল না আল্লারাখাকে তার বাবা দলে নিয়েছেন শুনে। সে যে দল একদিন ভাঙতে পারে সে সম্ভাবনাও তাকে বিচলিত করতে পারল না। সামাদ এ সব বলে কয়ে চম্পার একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে, দলের একজন বলে দুর্ভাবনার দাবি দেখাচ্ছে সেটাও চোখে পড়ল না চম্পার। সে বসে বসে জিনিসের লিস্টি মেলাতে লাগল। চম্পার মন ছিল না এখানে, কিংবা কোনখানে। নিজে সে জানতেও পেল না, একটা বিরাট হাই তুলল চম্পা।

আল্লারাখা খেল অত্যন্ত অল্প। প্রফেসর খেতে খেতে নিজে তাকে তুলে দিচ্ছিলেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিল সে। ব্যাপার্টির চারমূর্তি অবাক হল, একটা মানুষ এতো কম খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে কী করে? এ যে একেবারে পাখির আধার! তাহোক, বাঁচলে পেট পুরে

খেতে পারবে খাড়ানাক, বোচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। সবার পরে ওরা খেতে বসবে। শোবার কিছু সঙ্গে নেই, প্রফেসর তাকে কালো আলখাল্লাটা বিছোতে দিলেন আর একটা বালিশ! চম্পার বদ অভ্যেস, দুটো বালিশ না হলে ঘুমোতে পারে না–তার একটা। একঘরে থাকতো সামাদ আর জহির। সামাদকে ব্যাপার্টির সঙ্গে শুতে বলে আল্লারাখাকে তার জায়গায় যেতে বললেন প্রফেসর। কিন্তু সে উত্তর করল, এইটুকু তো রাত। এই বলে সে বালিশ নিয়ে স্টেজের এককোণে শুয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে শেয়ালের ডাকে সাহস ফিরে এলো। তারা দল বেঁধে হাঁটতে লাগল বড় সড়কে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে বাঁশবনের এপার ওপার করতে লাগল, যেন এটা তাদেরই রাজত্ব। চোখ জ্বলতে লাগল, যেন কোন জ্ঞানী মানুষ মজার ব্যাপার দেখে হাসছে। রাত চৌকিদারেরা ঘুমিয়ে পড়ল লাঠি হাতে টর্চ কোমরে খুঁজে পথের এখানে ওখানে বসবার জায়গা খুঁজে নিয়ে। রেলইয়ার্ডে পানির ট্যাঙ্ক থেকে টপ টপ টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল। একটা রাস্তা–তার এ মাথায় ঘুম আর ও মাথায় জাগরণ! আল্লারাখা একবার শেষ অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলো এ মাথায়, আবার গেল, আবার ফিরে এলো, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, আবার চলতে লাগল, গেল, ফিরে এলো, গেল, আবার ফিরে এলো।

বালিশে মৃদু সুবাস। অনেক রাত ধরে পরতে পরতে জমেছে, জড়িয়ে গেছে। দুএকটা দীর্ঘ চুল লেগে আছে এখনো। আল্লারাখার ঘুমন্ত গালের নিচের সেই চ্যুত চুলগুলো শিরশির করে নদীর মতো সচল হয়ে উঠছে। আর সেই সুবাস; বোঝা যায় কি যায় না, হয়তো নেই। কোন ফুল, গাছ, পাতা কারো নয়। বোধহয় এরকম সুবাস থেকে আসে

তার গোলাপের সুগন্ধ। আল্লারাখা আবার সেই রাস্তাটা দিয়ে বিলের মতো চলতে শুরু করল।

চোখ খুলে দেখল মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে চম্পা দাঁড়িয়ে আছে। আর চম্পা দেখল, স্টেজের এককোণে, ধূলোভর্তি পাটাতনে কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আল্লারাখা তখন তার বালিশের পরতে পরতে জড়ানো সুবাসের কথা জানতে পারল। চম্পার মনে হল লোকটার মতো একা আর কেউ নেই– এ একাকীত্ব এতে নিবিড় যেন একটা জামা, যা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে। তাই তার ইচ্ছে করলেও সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না, স্পর্শ করতে পারল না, কথা বলতে পারল না। চম্পার মনে হল, তার ঘুমের ভেতর থেকে তাকে ডেকে এনেছিল লোকটা, এখন কাজ হয়ে গেছে, এখন সে যেতে পারে। সে চলে গেল। তখন আল্লারাখা হাঁটতে হাঁটতে সেই রাস্তার শেষ মাথায় ঘুমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সারারাতে আর একবারও ফিরে এলো না।

.

কুড়িগ্রামে একদিনের বদলে আরো তিনদিন শো করতে হলে প্রফেসর নাজিম পাশাকে। এন তার শো–এর সব সেরা ও শেষ আইটেম রক্তগোলাপ। ডাকবাংলোর রাস্তায় যেতে পড়ে ছবিঘর, সেটা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হল। সবাই টাউন হলে আসছে ম্যাজিক দেখতে। রাতারাতি গজিয়ে গেছে চা–পান বিড়ির দোকান। লোক আসছে বন্যার মতো নাগেশ্বরী, ভোগডাঙ্গা, পলাশবাড়ি, কালিগঞ্জ, কাঠাবাড়ি, রাজার হাট, সিন্দুরমতি– কোন

গ্রামের আর কেউ বাকি রইল না। লালমনিরহাটে বায়না হয়েছিল, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনদিনের দিন রওয়ানা হতে হল প্রফেসরকে। পর পর বায়না রয়েছে রংপুর, নীলফামারী, বামনডাঙ্গা, গাইবান্ধা, বগুড়া, শেরপুর হয়ে পাবনা, উল্লাপাড়া আর কিশোরগঞ্জে।

এর মধ্যে চম্পার জেদে নাম পাল্টাতে হয়েছে আল্লারাখাকে। সেই বৃষ্টি বিকেলের পরদিনই। নাম শুনে হি হি করে হেসেছিল চম্পা, নতুন নাম দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল সে। অবশেষে প্রফেসরই বাচালেন। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ জেগে উঠে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন, চম্পা চম্পা। হয়ে গেছে।

চম্পা দৌড়ে এসে শুধোল, কী বাবা, কী হয়ে গেছে?

প্রফেসর বললেন, নাম। ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্ন দেখলাম, যেন একটা ভারি সুন্দর জায়গায় চলে গিয়েছি, বুঝলি? লোকে বলল, এটা বেহেশত। ন্নাত। হঠাৎ দেখলাম একটা বাগান। হাজার হাজার গোলাপ। হাসছে, ঝলমল করছে, লাল রঙটার ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে যেন। আর কস্তুরীর মতো ঘ্রাণ। চম্পা, এ রকম অবাক কাণ্ড জীবনে দেখিনি। যখন তুই মায়ের পেটে, তখন তোর মা এরকম স্বপ্ন দেখেছিল। বলতে বলতে গাঢ় হয়ে এলো তার কণ্ঠ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। তিনি বলে চললেন, আমাকে জাগিয়ে তুলে তোর মা বলল, আমি বেহেশতকে ফিরদৌসও বলে কি-না, তাই ও নামটা পছন্দ হয়েছিল তার।

চম্পা বলল, তার বদলে হলাম আমি। মা কী বলল তখন?

তোর মার কি আর মনে ছিল? বলে, আমারই ছিল না। ফুটফুটে দেখে তোর নাম রাখলাম চম্পা? হঠাৎ আজ মনে পড়ল। কী আশ্চর্য আল্লারাখার নাম নিয়ে সকালে এতো জল্পনা করলি। নাম রেখে দে ফিরদৌসি। কী বলিস? ওর খেলার সঙ্গে মানাবে ভাল।

স্ত্রী যে নামটা একদিন পছন্দ করেছিলেন সেটা কাউকে দিয়ে দিতে যেন তার সংকোচ করছে। যেন ঘরের জিনিস না বলে না কয়ে দান করে দিচ্ছেন। চম্পার মুখের দিকে তাই উদগ্রীব হয়ে তাকালেন তিনি। যেন চম্পা বললেই নিজের আর অপরাধ থাকে না। চম্পা বলল, চমৎকার! কী যে নাম রেখেছিল ওর বাপ-মা, হাসি পায়, না বাবা?

চম্পা নিজেই গিয়ে খবরটা দিয়ে এলো আল্লারাখাকে। বলল, আজ থেকে ফিরদৌসি বলে সব সময় ডাকা হবে। ডাকলে যেন সাড়া পাই।

আচ্ছা। বেশ নাম। আল্লারাখা তখন কোথা থেকে চামড়া এনে কালকের পুড়ে যাওয়া ড্রাম মনোযোগ দিয়ে মেরামত করছিল।

সে রাতের শো-এ সমস্ত আইটেম যখন শেষ হয়ে গেল, তখন প্রফেসর নাজিম পাশা স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার তালি দিলেন। এরপর ঘোষণা করলেন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শেষ আইটেম রক্তগোলাপ। করতালিতে ভরে উঠল টাউন হল। সাত আসমান আর দো-জাহানের লাখো কুদরৎ-এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ-

একটানা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন প্রফেসর নাজিম পাশা–সারা দুনিয়ার বড় বড় যাদুকর, বড় বড় ম্যাজিশিয়ান, বড় বড় কুদরতি কামেল পর্যন্ত এ খেলার সন্ধান জানে না। শত শত বৎসরে একজন মাত্র একজনকে এই অদ্ভুত মায়া শক্তি দেওয়া হয়। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য রক্তগোলাপ। বাগান লাগে না গাছ হয়; পানি লাগে না বড় হয়; দুনিয়ার সাত ভেজালে বাধা চোখ দিয়ে সে ফুল দেখা যায় না। সেই ফুল, সেই রক্তগোলাপ দেখাবেন আজ আমার প্রিয় সাকরেদ ফিরদৌসি। ব্যাণ্ডপার্টি প্রবল বিক্রমে শুরু করল বাজনা, শ্বাসরুদ্ধ করে বসে রইল দর্শক, প্রফেসর বাজনার তালে তালে বলে চললেন, ফিরদৌসি আমার প্রিয় সাকরেদ–রক্তগোলাপ। ভাগ্যবানেরা একটি করে পাবে বাড়ি নিয়ে যাবেন খোশবুতে ভরে উঠবে ঘর। বিলাত থেকে তোক এসেছিল, আমেরিকা লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল, জাপান হাওয়াই জাহাজ পাঠিয়েছিল, তবু আমার সাকরেদ ফিরদৌসি তার দেশ ছেড়ে যায় নাই। বন্ধুগণ, টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সাধনা করে পাওয়া যায় না, সাত আসমান আর দো–জাহানের লাখো কুদরৎ এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ।

স্টেজে এসে তখন দাঁড়াল ফিরদৌসি। নীরবে নত হয়ে সালাম করল। পর মুহূর্তে তার হাত দুটি রূপান্তরিত হল বিদ্যুতে। ঝড়ের মতো উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল গোলাপ, বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল, ঝর্ণার মতো নাচতে লাগল অসংখ্য গোলাপ। করতালিতে মুখর হয়ে উঠল হল।

কড়িগ্রাম থেকে ডেরা তুলবার আগে প্রফেসর আবার তার প্ল্যাকার্ড আঁকিয়ে নিয়েছেন ওখানকার একমাত্র সাইনবোর্ড লিখিয়ে জীবন রায়কে দিয়ে। এবারে প্ল্যাকার্ড আরো বড়

করা হয়েছে। তার মাথায় এবার আঁকা হয়েছে ফিরদৌসি আর রক্তগোলাপের চিত্র। পয়সা নামমাত্র নিয়েছেন জীবন বাবু, পরিবার নিয়ে সামনের সারিতে বসে সেকেণ্ড অফিসার, সার্কল অফিসারদের সঙ্গে শো দেখতে পেয়েছেন ফ্রি পাসে, তাতেই খুশি। ফিরদৌসি তাঁকে একটা বড় গোলাপ দিয়েছিল স্টেজ থেকে নেমে এসে, সেইটে দোকানে রেখেছেন তারপিনের খালি শিশিতে পানি ভরে, জিইয়ে। রাস্তার লোক ধরে ধরে গল্প করলেন কদিন, বুঝলে হে। সবাইকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আমাকে দেখে একেবারে নেমে এসে– দেখছইতো কতো বড়, এতো বড় আর কেউ পায়নি।

লোকেরা তাজ্জব হয়ে দেখে আর মাথা নাড়ে। কেউ কেউ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। বলে, একেবারে সত্যি গোলাপ হে! সেইটেই আশ্চর্য। বোজ বোজ এতো গোলাপ আসে কোত্থেকে?

উত্তর দিতে পারে না কেউ। নানারকম গুজব। একেকজনে একেক কথা বলে। কিন্তু কারো কথাই কাজের মনে হয় না। সবাই চোখ চাওয়া–চাওয়ি করে। সত্যিই তো, এতো গোলাপ আসে কোথা থেকে? যতই বলুন প্রফেসর নাজিম পাশা, বাগান লাগে না গাছ হয়, লোকরা মনে মনে কল্পনা করতে থাকে মাইল দুমাইল জুড়ে এক বিরাট বাগানের।

দলের কাছেও এ এক বিরাট রহস্য। ফিরদৌসির গুণটা কোথায়? প্রথম কদিন কেউ তাকে জিগ্যেস করতে সাহস পায় না। সাহস ঠিক নয় সুযোগ হয় না। বলতে গেলে কারো সঙ্গে কথাই বলে না ফিরদৌসি। কখন বসে একটুখানি খেয়ে নেয়। সারাদিন একটা পাতা কী কাঠি কী ফড়িং যা পায় তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে থাকে, যেন এই

প্রথম দেখছে। শো র সময় আরেক কাণ্ড! পোশাক পরবার পর থেকে হাত পা কাঁপতে থাকে। ভীষণ ভয় করতে থাকে তার! ঠোঁট শুকিয়ে যায়। তারপর খেলা দেখিয়ে মরা একটা মানুষের মতো গা হাত পা ছেড়ে শুয়ে থাকে, সংকুচিতভাবে, চোরের মতো, বারান্দায় কী স্টেজের এক কোণায় বিছানা পেতে। একটু ভাল ঘর, বিছানা, খাওয়া দিতে গেলে বা কেউ কথা বললে বিব্রত হয়ে পড়ে, বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ মানুষকে জিগ্যেস করাও ঝকমারি। কদিন সবাই চোরা নজরে রাখে ওকে, যদি রক্তগোলাপের হদিশ পাওয়া যায়। তাতেও কোন লাভ হয় না। এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যায় না ফেরদৌসি, চোখের আড়াল হয় না। সামাদ একদিন সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে। নাঃ, ঘুম থেকে একবারও কোথাও উঠে যায়নি ফিরদৌসি। জহির, যে জহির প্রথম দিন মেসমেরিজম বলে তুচ্ছ করেছিল, ভাবনায় পড়েছিল সেও। আসলে সেও বুঝতে পেরেছে, এ মেসমেরিজমের কর্ম নয়। তাহলে গুণটা কোথায় ফিরদৌসির?

কদিন পরে দলে যখন একটু পুরনো হল সে তখন খুচরা জিগ্যেসাবাদ শুরু হল। কখনো সামাদ, কখনো ব্যাপার্টির চারমূর্তি, কনো জহির। দলের পশার বেড়ে গেছে ফিরদৌসি যোগ দেবার পর, রোজ নতুন বায়না আসছে, জহিরের এটা সহ্য হয় না। ফিরদৌসির দিকে তার তাচ্ছিল্য তাই দিনে দিনে বাড়ছিল, আর মনে মনে ভাবছিল গুণটা জেনে নিতে পারলে ঘাড় ধরে নাবিয়ে দেয়া যেতো রাস্তায়। জহির একে ওকে লাগায়। তাদের প্রশ্ন শুনে ফিরদৌসি ম্লান হাসে, বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। যেন এদের ভাষাটাই সে বুঝতে পারছে না। চম্পার জন্যে মনটা তার কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, কারণ চম্পা তাকে জিগ্যেস করে না, তার গোলাপ দেখে অবাক হয় না। ফিরদৌসি যেন বুঝতেই পারে না, তার গোলাপ দেখে এতো অবাক হবার কী আছে?

এদিকে আরো ব্যাপারে শান্তিটুকু বলতে নেই জহিরের। সেদিন সেই রাতের পর চম্পা তাকে আর দশ হাতের মধ্যে আসতে দেয় না। হাসতে গেলে মুখ আঁধার করে ফেলে, কথা বললে উত্তর দেয় না। চম্পাকে আর একা পাওয়া যায় না। রক্তে যে আগুন ধরেছে সে রাতে, থেকে থেকে তা জহিরকে এমন করে পোড়ায় যে মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায়। তখন মোদক দুচার দলা মুখে না দিলে শরীরটাতে আর ঝিম আসে না। কেন যেন তার সব রাগ গিয়ে আরো বেশি করে পড়ে ফিরদৌসির ওপর।

একদিন প্রফেসরকে বলেই ফেলল জহির, ওস্তাদ, আমরা না হয় ফ্যালনা চ্যালা। আপনাকে তো সে গোলাপের গুণ বলতে পারে। আমরা না হয় দেমাক সইলাম, আপনাকে যে ব্যাটা অপমান করছে, এটা আমাদের সহ্য হয় না। সাচ্চা সাকরেদ হয়, বলুক সব খুলে আপনাকে।

প্রফেসর তাকে শান্ত করলেন বুঝিয়ে। নিজেও ভাবলেন, সত্যি, আমাকে অন্তত ফিরদৌসির বলা উচিত। পুরনো সাকরেদ জহির, তার দিকে টান আছে বলেই না যে কথা তিনি খেয়াল করেননি, সেটা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

তখন শো হচ্ছিল নিলফামারীতে। এক রাতে শো শেষে ফিরদৌসিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে দোর বন্ধ করে তিনি জিগ্যেস করলেন, তোমার গুণটা আজ আমাকে বলো। আর কিছু না।

ফিরদৌসি অবাক হয়ে চোখ তুলল। যেন এতোদিন ধরে ফিসফাস চলছে তার বিরুদ্ধে এইটে সে আজ হঠাৎ বুঝতে পেরেছে।

ফিরদৌসি।

কী?

বলো।

চুপ করে রইল সে। তখন প্রফেসর কাঁধে হাত রেখে অভয় দিলেন, এখানে কেউ নেই। কেউ জানবে না। আমি কসম করছি ফিরদৌসি, কাউকে বলবো না তোমার গুণ। বলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন প্রফেসর। তবু কোন জবাব নেই। তখন অন্য পথ ধরলেন, দ্যাখো ফিরদৌসি, আমাকে তুমি ওস্তাদ মানো?

জি।

দলে নেবার সময় তোমাকে হাত ধরে সাকরেদ করেছিলাম?

জি।

ওস্তাদকে না বলা, তার কথার অবাধ্য হওয়া, ভাল?

চৌকির ওপর বসে বসে ঘামতে লাগল ফিরদৌসি। বিছানার ওপর প্রফেসরের যাদুর লাঠিটা পড়েছিল, খামোকা সেটা নাড়তে লাগল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল তার গায়ে নানা রংয়ের আংটিগুলো। বুক ফেটে যেতে লাগল ফিরদৌসির। কিন্তু কথা বলতে পারল না।

তখন প্রফেসর নিরাশ হয়ে তার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। বললেন, আমার শো-এর সব খেলার গুণ আমার জানা। এ না হলে দল চলে না। জহির, সামাদ, চম্পা– এরা সবাই আমার হাতে গড়া আর্টিস্ট। সবাই আমাকে জানাতে বাধ্য। তোমার বেলায় এতোদিন জানতে চাইনি, ভেবেছিলাম নিজেই বলবে। আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে একদিন। এতোদিন হয়ে গেল, এখনো যদি না বলো আর চলে না। দলের সবাইকে আমি বলবো কী?

উৎকর্ণ হয়ে প্রফেসর জিগ্যেস করলেন, কী, কী বললে?

একটা উত্তর দিয়েছিল ফিরদৌসি। আবার সে বলল, তেমনি অস্ফুট স্বরে, তাহলে, আমি বরং চলেই যাই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রফেসর। বলে কী! চলে যাবে। আর একটা কথা বলতে পারলেন না তিনি। মনে হল, ডান হাতখানা কে কেটে নিয়ে গেল। চোখের সমুখে লাফিয়ে জীবন্ত

হয়ে উঠল আবার সেই ছবি হলে দর্শক নেই, দুবেলা শুধু খিচুড়ি, পোশাকে তালির পর তালি পড়ছে, ট্রেনের টিকেটের পয়সা নেই। ফিরদৌসি আসবার পর গত দুমাসে পশার এতো বেড়েছে, পয়সার ঝনঝন এতো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে, সে কখনো চলে যাবে, যেতে পারে, এটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখছিলেন পাকিস্তান যাবেন, ইরান–তুরান যাবেন, বিলাত আমেরিকায় শো করবেন, পাল্লা দেবেন পি.সি, সরকারের সঙ্গে সব যেন দপ করে নিবে গেল ফিরদৌসির একটা মাত্র কথায়।

ফিরদৌসি আস্তে আস্তে চৌকি ছেড়ে উঠে, দরোজা খুলে, বাইরে মধ্যরাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অসহায়ের মতো বোবা চোখে সেই অসম্ভব তাকিয়ে দেখলেন প্রফেসর নাজিম পাশা।

চম্পা এ ঘরে এসেছিল, অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। বাবা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বসে আছেন। চৌকির ওপর, দুটো হাত হাঁটুর ওপর রাখা, কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। বাবাকে আজ কাঁদতে দেখে সত্যি অবাক হল চম্পা। কারণ বাবা গত দুমাসে একদিনও কাঁদেনি। চম্পা ভুলেই যেতে বসেছিল বাবার ওই শিশুর মতো কান্নার স্বভাবকে। আজ কেন যেন তার অশ্রু ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বড় দুর্বল মনে হল নিজেকে। মনে হল, তার কেউ নেই। আর দাঁড়াতে পারল না সেখানে, দেখতে পারল না বাবাকে; চৌকাঠের বাইরে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা।

পটকা বিছানা বগলদাবা করে শুতে যাচ্ছিল, চম্পাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল, কী?

চম্পা তখন ম্লান হেসে উত্তর দিল, নারে কিছু না। তুই ঘুমোগে। বড্ড গরম পড়েছে।

চলে গেল পটকা। তখন আরো একা লাগল চম্পার। আস্তে আস্তে প্রাণহীনের মতো বসে পড়ল সে টুলের ওপর। শেষ হ্যাঁজাকটা জ্বলছিল শেষ প্রান্তে জহিরদের কামরায় শো হচ্ছিল হাইস্কুলে আমের বন্ধে–নিভে গেল! যেন লাফিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ চারদিকের ওৎ পেতে থাকা অন্ধকার। স্কুলের সামনে বিরাট জামরুল গাছের পাতা সরসর করতে লাগল। দূরে একটা লিচু গাছে ঢন্ ঢন্ করে বাজতে লাগল বাদুর–তাড়ুয়া টিন। একটা কুকুর রাস্তার ওপর বেরিয়ে এসে চারদিকে দেখল, মাটি শুকল তারপর জ্বলজ্বল কোটি কোটি তারার দিকে মুখ তুলে অবিকল মানুষের বাচ্চার মতো কেঁদে উঠল।

.

ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল চম্পা। বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখে বাবা তার চৌকিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নিচে মাটিতে রাখা হারিকেন জ্বলছে চোখ বুজে। আর কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। কিন্তু তবু কে যেন তাকে ডাকছে, শোনা যাচ্ছে না, বুকের ভেতরে ঠেলে ঠেলে উঠছে নিঃশ্বাস।

স্কুলের প্রায় সবগুলো দরোজাই ভোলা। অন্ধকারে তারা হাঁ করে আছে এক অমিত ক্ষুধা নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের সামনে বাতি নিয়ে দাঁড়াল চম্পা। এ ঘর সে ঘর খুঁজল, কিন্তু পেল না। লম্বা বারান্দায় কাঠের থামগুলো একের পর এক পেরিয়ে এসে নিরাশ হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল সে। আবার কেঁদে উঠল সেই কুকুরটা। আবার ঠেলে ঠেলে নিঃশ্বাস। আবার খুঁজল চম্পা। তখন পেল। একেবারে মুখের পরে মুখ রেখে ফিসফিস করে ডাকল– ফিরদৌসি।

সে শুয়েছিল একা একটা ঘরে, শানের ওপর, বুক অবধি পা দুটো টেনে, জড়সড় হয়ে। মাথা থেকে সরে গেছে বালিশটা।

সেই রাস্তায় ঘুমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল ফিরদৌসি, হঠাৎ বিহ্বলের মতো চলতে শুরু করল। মাঝপথে এসে থামল, বুঝতে পারল না। কোন দিকে যাবে। ফিরে যাচ্ছিল, আবার থামল। তারপর এ মাথায় এসে দেখতে পেল চম্পাকে, চম্পার নতমুখে একগুচ্ছ চুল। বলল, চম্পা, আমি যাবো না, আমি যাব না।

তার কপালে হাত রাখল চম্পা। ফিরদৌসি সে হাত ধরে উঠে বসল তখন। বলল, কেন ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে?

কী?

আমি যে কিছু বলতে পারি না। আমি যেতে চাই না, চম্পা। বলতে বলতে সে হাত রাখল চম্পার চুলে, সেখান থেকে বেরুল গোলাপ। স্বপ্নের মতো হাসল চম্পা। এক হাতে সেটাকে সে ধরে রইল দুজনের মাঝখানে। চম্পা বলল, চলো, আমরা যাই। যাবে?

কোথায়?

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। নাগরদোলার মতো তাদের চোখ থেকে চোখে উঠতে পড়তে লাগল আনন্দ, বিষাদ, বাস্তব, বিভ্রম।

ফিরদৌসি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুলের মধ্যে ঠোঁট রেখে বলতে লাগল, প্রথম যেদিন এলাম, তোমার কপালে এসে পড়েছিল চাঁদের মতো কয়েকটা চুল। তোমার মনে নেই চম্পা? আমার তখন মনে হল, আমি পারি। তোমার চুলের ভেতর থেকে আমি প্রথম গোলাপটা পেয়েছিলাম। না?

রাস্তার ওপর থেকে কুকুরটা তখন বনের দিকে চলে গেল। পাতার মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল রাত্রির বাতাস, যেন সেও উর্ণ হয়েছে শুনবে বলে।

আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে, ঐ তো গোলাপ। ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি চম্পা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। রঙ, গন্ধ, সব। আমি হাত দিই, হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি গোলাপ। তখন আমি চারদিকে গোলাপ দেখতে পাই। আমার মন বলে, হাত দিয়ে ছুঁলেই ওরা আমার হাতে এসে পড়বে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে?

চম্পা তার বুকের পরে মুখ রেখেই বলল, না।

তোমার বিশ্বাস হয় না?

হুয়।

তোমার বাবা জিগ্যেস করলেন, আমি বলতেই পারলাম না।

চম্পা মুখ তুলে বলল, চলো, আমরা যাই।

কান্নার মতো করে উঠল ফিরদৌসির মুখ। শুধোল, কেন চম্পা?

আমার খুব দুঃখ। আমি খুব একা। আমি তো আর কিছু না, আমাকে ওরা আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। বাবাও না। বাবার জন্যে জহিরকে আমি কিছু বলতে পারি না। আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে নিয়ে চলো তুমি।

তখন ফিরদৌসি হাসল। ছিঃ, দুঃখ থেকে পালায় না চম্পা। দুঃখ থেকে আনন্দ আনতে হয়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে চম্পা। আনমনে বাতিটা নিয়ে বড় করে, ছোট করে। ব্যাকুল দুচোখ মেলে ফিরদৌসি বলে, আমার গোলাপ চম্পা আমি তো জানি নেই। তবু ভেতর থেকে যখন খুব বিশ্বাস হয়–আছে, তখন হাত দিলেই পাই। পালাবে কেন? দুঃখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো–ঐ তো, কই দুঃখ? ঐ তো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দ্যাখো চম্পা, ঐ তো তোমার সব আনন্দ ফুলের মতো হাসছে। ছিঃ, পালাবে কেন?

চম্পাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নিল ফিরদৌসি। তখন চম্পার মনে হল, তার আর কোন দুঃখ নেই। তার যাযাবর জীবনে একাকীত্ব নেই, বাবার পেশায় আত্মদানেও বেদনা বা জ্বালা নেই, জহিরের লোভাতুর হৃদয়টাও যেন তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। বেঁচে থাকার প্রবল তাগিদে যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা, বেঁচে থাকার জন্যে যতো মৃত্যুকে তার স্বীকার করে নিতে হয়েছে, সব এই মুহূর্তে ঝলমল করে উঠল এক অখণ্ড গৌরবে, অহংকারে।

ফিরদৌসি বলল, কেউ বিশ্বাস করবে না চম্পা।

চম্পা বলল, হ্যাঁ কেউ বিশ্বাস করবে না।

সেই রাস্তায় ফিরদৌসি দেখতে পেল চম্পা তার পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এবার আর কোথাও থামল না, একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা দুজন। বাতাস আবার সরসর করতে লাগল জামরুলেব পাতায়। বাদুর-তাড়ুয়া টিন আবার সারারাত টন্ টন করতে লাগল। বনের মধ্যে পাতায় ছাওয়া নিবিড় একটা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকল সেই কুকুরটা।

জহির বলল, আমি নিজে দেখেছি ওস্তাদ। পটকা, বোচানাক ওরাও দেখেছে। বাঞ্চোতের সাধুপনা আজ আমি গলায় পা দিয়ে বর করবো। কুত্তা কাঁহি কা।

প্রথমে দেখেছিল বোচানাক। ভোরবেলায় উঠে টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিল, দেখে দরোজা হাট করা। ভেতরে ফিরদৌসির বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে চম্পা।

প্রফেসরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল জহির। চিৎকার করে বেলা মাথায় তুলে ফেলল– আমি আর একদণ্ড নেই দলের সঙ্গে। এ সব ত ম দেখতে পারবো না। গোলাপের গুণ এতো করে জিগ্যেস করল তবু বলল না। কতো বড় ওস্তাদ? এখন আবার ছি ছি কেলেঙ্কারী! এই আমি চললাম। দেখি, কে আমাকে রাখে। ওস্তাদ তো বুড়ো হয়ে চোখের মাথা খেয়েছে। আমি না থাকলে কবে ছত্রখান হয়ে যেতো।

তাকে আর কিছুতেই থামানো গেল না।

প্রফেসর প্রথমে বিহ্বল, পরে ভীত, শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। গতরাত্রে ফিরদৌসির ব্যবহারে এমনিতেই মর্মাহত হয়েছিলেন, আজ এ কথা শুনে আগুন জ্বলে উঠল শরীরে। তার ওপরে বারান্দা থেকে জহিরের ক্রমাগত দল ছেড়ে যাওয়ার হুমকি শুনে পায়ের নিচে এক ফোঁটা মাটি পেলেন না তিনি।

ওদিকে এতো চিল্কারের উৎপত্তি, দুজন জেগে গেছে। তারা দুজন দুজনের দিকে তাকাল, সে দৃষ্টিতে বিনিময় হল আমরণ বিশ্বাসের এক ক্ষণবিদ্যুৎ।

চম্পা বেরিয়ে এসে বারান্দা ঘুরে, ঘরের মধ্যে প্রফেসর আর বাইরে জহির ও ব্যাপার্টির চারমূর্তির সমুখ দিয়ে মাথা উঁচু করে, স্মিত মুখে চলে গেল যে ঘরে উনুন করা হয়েছিল।

সেখানে সে ছাই তুলে দাঁত মাজতে লাগল টুলের ওপর নির্বিকার বসে বসে পা দুলিয়ে। পটকা এলো, তার পায়ে পা দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, কচ্ছপের মতো আর হাঁটতে হবে না। চা কর শীগগীর, খিদেয় মাথা ঘুরছে। পটকা যেন সে কথা শোনেইনি, চোয়াল ঝুলিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তখন চম্পা তার কান ধরে উনুনের কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, কান তো নয়, দুটো আমের আঁটি। কী শক্তরে বাবা!

ফিরদৌসি এসে দেখল পায়রার খোপে পায়রাগুলো ডানা ঝটপট করছে আর তারের জালে ঠোঁট ঘষছে, যেন কেটে ফেলবে। সে চোখ গোল করে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া। তারপর একটা একটা করে তাদের বার করতে লাগল আর আঙুল দিয়ে পালকে চিরুনি করতে করতে আদর করল, নকল স্বরে বাক্–বাকুম ডাকল, গালে গলায় চেপে ধরতে লাগল চোখ বন্ধ করে, ঘষতে লাগল।

সে রাতে চম্পাকে জোর করে অঙ্কশায়িনী করবার পর থেকে মনের মধ্যে একটা গ্লানি ছিল জহিরের যেটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। চেঁচামেচি করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল গ্লানিটা যেন আর নেই। তখন আরো চিৎকার করতে লাগল সে, জেদি একটা খোকার মতো এক কথাকেই বারবার বলতে লাগল, শেষে তেড়ে গেল ফিরদৌসিকে আজ

একচোট শিক্ষা দেবে বলে। আজ একটা সুযোগ, আজকের আগুনেই তাকে জঞ্জাল পুড়িয়ে পথ পরিষ্কার করতে হবে। রোষটা নিভে যেতে দিলে চলবে না।

ওরে বদমাশ, পায়রা আদর করা হচ্ছে। ফিরদৌসিকে দেখতে পেয়েই তিড়বিড় করে উঠল জহির। তার পেছনে এসেছেন প্রফেসর, নিঃশব্দে। জহির বলল, কথার জবাব নেই কেন?

ফিরদৌসি বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। বলল, আমাকে কিছু বলছিলে? বলেই সে আবার পায়রার দিকে মনোযোগ দিল।

চিৎকার করে উঠল জহির, তোমার আস্পর্দা আমি দেখছি। আমার বউয়ের ওপর মেসমেরিজম? তার জাত নষ্ট করা?

তোমার বউ? অবাক হল ফিরদৌসি।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল জহির। তারপরই স্বমূর্তিতে ফিরে গেল সে। ঐ একই কথা। বউ না হোক, চম্পার সাথে আমার বিয়ে হবে।

আমি তো চম্পাকে বললাম, পালাতে নেই। তোমাকে বলেনি?

এবার জহিরের অবাক হবার পালা। প্রফেসরও বিস্ময়ে বলে উঠলেন, কে পালাতে চায়?

তেমনি শান্তকণ্ঠে পায়রা আদর করতে করতে ফিরদৌসি জবাব দিল, কেন, চম্পা। বোকা মেয়ে, ওকে বললাম...

জহির প্রফেসরকে বলল, ওস্তাদ, চম্পাকে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটছে। এখন ধরা পড়ে মিউ মিউ করছে মেনি বেড়ালের মতো। বটে, পালাতে হলে জানটা রেখে পালাবি হারামজাদা।

বলেই এক ঝটকায় ফিরদৌসিকে টেনে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল জহির। এই আকস্মিকতায় হঠাৎ ফিরদৌসির হাত থেকে পায়রাটা ছাড়া পেয়ে গেল, বিষম ভয় পেয়ে সেটা এক প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জহিরের মুখে মুখটাকে একটা কার্নিশ কী গাছের ডাল মনে করে সেখানে বসবার জন্যে দুপায়ের তীক্ষ্ণ নখর মেলে আঁচড়াতে লাগল। মুহূর্তে সূতোর মতো অসংখ্য রক্তাক্ত রেখা ফুটে উঠল জহিরের মুখে। বিকট আর্তনাদ করে উঠল সে। দুহাতে মুখ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে প্রফেসর আরে এ-কী করতে লাগলেন। তখন ফিরদৌসি খপ করে পায়রাটাকে ধরে হাতের এক লম্বা দুলুনি দিয়ে উড়িয়ে দিল জানালা দিয়ে।

তার চিৎকারে ছুটে এলো সবাই। ব্যাপার্টির চারমূর্তি রক্ত দেখে খুন খুন বলে লাফাতে লাগল। সামাদ এসে চেপে ধরল জহিরের হাত। জহির হাঁপাচ্ছিল, তখনো মুখ ঢাকছিল, যদিও পায়রাটা ছিল না। প্রফেসর তাকে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ চুপ। তার সবচে বড়

ভয়, বাইরের কেউ শুনতে পেলে দলের সুনাম নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। সবার শেষে এসে দাঁড়াল চম্পা।

চম্পা যেন তার বাবাকে আজ আর চিনতে পারল না। রুষ্ট স্বরে, সম্রাটের মতো তাঁর কণ্ঠে আদেশ, এই ওকে ঘরে নিয়ে ওষুধ দাওগো। চম্পা, তুমি যাও, আমার হাত-বাসে ওষুধ আছে। সামাদ, বাইরে দাঁড়িয়ে দ্যাখো, বাজে লোক ভিড় করতে দিও না।

আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল ঘর। কেবল প্রফেসর আর ফিরদৌসি মুখোমুখি।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেল। যেন এ নিস্তব্ধতা আর কোনদিন ভাঙবে না। হঠাৎ ফেটে পড়লেন প্রফেসর নাজিম পাশা বেরিয়ে, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল ফিরদৌসি।

আমি ঢের সহ্য করেছি। কাল রাত্তিরে আমার কথার জবাব না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলে। এখন বুঝতে পারছি, সাহসটা কোথায়। করো তো বাপু মেসমেরিজম। তাই বলে আমার মেয়ের ওপরেও? তবে জেনে রাখো, মেসমেরিজম আমিও জানি। আমিও পারি তোমাকে এক পায়ের ওপর সারা জীবন দাঁড় করিয়ে রাখতে, বোবা বানিয়ে রাখতে পারি, কুঁজো বানিয়ে রাখতে পারি, রাস্তার কুকুর করে রাখতে পারি। আমার মেয়েকে নিয়ে পালানোর মতলব? আমার খেয়ে আমারই শত্রুতা? ইতর, বদমাশ, বেরিয়ে যাও।

একটা কথার জবাব দিল না, প্রতিবাদ করল না ফিরদৌসি। প্রফেসরকে সে ভক্তি করতো, প্রথম দিন থেকে সবাই তাকে দূরের আর অহলার মনে করেছে, একমাত্র প্রফেসর করেননি–তখনই যেন সে কেনা হয়ে গিয়েছিল তার। সে কথা আজো ভোলেনি ফিরদৌসি! চোখ ফেটে পানি আসতে চাইল। মনে হল, তার বাবা মরে গেলেন এই মাত্র। সবচে বড় হয়ে বাজল, মেসমেরিজমের অভিযোগ। জহির বলেছে, কিছু মনে হয়নি। প্রফেসর বললেন, আত্মধিকারে ভরে উঠল তার মন। মাথা নিচু করে সে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে প্রফেসর যখন দেখলেন চম্পা ওষুধ বার করে দেয়নি, আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে, অন্ধের মতো চড় বসিয়ে দিলেন গালে। চম্পা সে আঘাত সইতে না পেরে একটা হাতল ভাঙা চেয়ারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। এতোটা হবে ভাবেননি তিনি। কিন্তু হঠাৎ বিচলিত হতেও বাধল তার। তাই আরো গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি তুমি ভেবেছ কী? আমার চোখের ওপর, এতো সাহস তোমার? তোকে আমি সাত টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবো, আজই বিয়ে দেবো তোর। এতো বড় সাহস, আমি মরে গেছি মনে করেছিস?

পিটপিট করে চোখ খুলল জহির। ফিটকিরি দিয়ে মুখ ঘষে দিয়েছিল চালকুমড়ো, কনকন করছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ, তবু তাকাল জহির। একটু জোরে কঁকিয়ে উঠে জানান দিতে চাইল নিজেকে।

বোধহয় তাতে কাজ হল। প্রফেসর নতুন করে বলে উঠলেন, পালাবার মতলব দিচ্ছে, সে তোরই কপাল ভাঙবার জন্যে।

বাইরে জহির আবার কঁকিয়ে উঠল– চাই না, চাই না আমি কিছু। আমি একমুহূর্ত আর থাকবো না। সব খেলা আমি ফাঁস করে দেবো। দেখি কে আমাকে ঠেকায়! দেখি, কোন শালা শো দ্যাখে। আমি মানুষ না, না? চম্পা আমাকে অপমান করল সেদিন কিছু বললাম না। আর সহ্য করবো না। বেরিয়ে যাবো। সব ফাঁস করে দেবো। আমি কারো খাই না পরি?

মহা ফাঁপরে পড়লেন প্রফেসর। জহির দল ছেড়ে চলে গেলে যে একেবারে পথে বসতে হবে তাঁকে। আর তার ওপর যদি একেকটা খেলা সবার কাছে ফাঁস করতে থাকে তো আর ভাবতে পারলেন না তিনি। চম্পাকে ধমকে উঠলেন, জহিরকে হাতে করে শেখালাম পড়ালাম সে কার জন্যে রে? আমার কী? দেখি, আমি মরে গেলে কী খাস? দেখি, তোর বাড় কদ্দূর।

তারপর ধপ করে চৌকির ওপর বসে পড়লেন তিনি। চম্পা ভাবল, বোধহয় নিঃশব্দ আবার কাঁদছেন বাবা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল– না, অপলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, প্রফেসর বললেন, তোর বিয়ে দেবো জহিরের সাথে। কোন কথা শুনতে চাই না আমি।

খাঁড়ানাক সে সময়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, ওষুধটা।

ও হ্যাঁ, ওষুধটা। বলে প্রফেসর তার হাত-বাক্স থেকে মলমের কৌটোটা বার করে দিলেন।

.

ফিরদৌসি যেতে পারল না কোথাও, যদিও যেতে ইচ্ছে করল তার। কাঁদতে পারল না, যদিও কাঁদতে ইচ্ছে করল। স্কুলের পেছনে, পাঁচিলের ওধারে এককালে দালান ছিল, এখন শুধু ভিতটা আছে সেখানে গিয়ে সে বসল। সারাদিন বসে রইল সেখানে। প্রফেসর তাকে মেসমেরিজমের কথা বলে যে কষ্ট দিয়েছেন, তার কোন পরিমাপ নেই। তবু আঙুল দিয়ে ধূলোর ওপর দীর্ঘ দাগ দিল, ছোট করল, একেবারে মুছে ফেলল, আবার নতুন করে আঁকল সে। আবার, আবারও। সারাদিন। ব্যাপার্টির চারমূর্তি কুলি ছেলেদের ঘাড়ে পোস্টার তুলে হ্যাঁবিলের তাড়া নিয়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল নিত্যকার মতো শহর পরিক্রমায়। সে বাজনা কানেও গেল না ফিরদৌসির। কেউ তাকে খুঁজতে এলো না। সারাদিনের ক্ষুধা তৃষা কেউ কাছে এলো না। শুধু কেঁপে উঠল ঠোঁট। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে লাগল ফিরদৌসি। আমি কী করেছি?

আমার আমি চম্পা, কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কী করেছি? একটা বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করছিল তার সামনে, সবুজ চোখে তাকাচ্ছিল আর চোখ বুজছিল। সাহস করে যখন একেবারে কাছে এসে গলা তুলে ডাকল মিহি করে, তখন তাকে কোলে তুলে নিল সে। পেটে পিঠে হাত বুলাতে বুলোতে বলল, কিরে হতভাগা?

এতো নাচ দেখাচ্ছিলি কেন? পিঠ উঁচু করে পায়ে পায়ে ঘোরাই তোর সার হল। আমার কাছে কিছু নেইরে, কিছু দিতে পারবো না। তখন বিড়ালটা গরগর করে উঠল। ফিরদৌসি বলল, বললাম, আমার কিছু নেই। আচ্ছা এটা নিবি? বেড়ালটা তার হাতে অতবড় লাল গোলাপটা দেখে ভড়কে গেল, চোখ বুজল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর লাফ দিয়ে তীরের মতো পালিয়ে গেল। আর এলো না। হা হা করে হেসে উঠল ফিরদৌসি। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হতে বসল, শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়ল, তবু সে হাসি থামল না। তার দমকে চোখ ভরে গেল পানিতে, ঝর ঝর করে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। তারপর হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল, শুধু পড়তে লাগল পানি।

আবার অভিমানটা সচল হয়ে উঠল বুকের ভিতরে। গুমরে মরতে লাগল প্রফেসরের তিরস্মারগুলো। অবোধের মতো কয়েকবার মাথা নাড়ল ফিরদৌসি। হাতের গোলাপটা দেখল। আনমনে একটা পাপড়ি ছিঁড়ল তার। তারপর আরেকটা। এমনি করে সব কটা। ছিড়ি উড়িয়ে দিল বাতাসে। তারা পায়ের কাছে নিঃশব্দে এসে পড়তে লাগল। যখন শেষ হয়ে গেল আরেকটা গোলাপ বার করল সে ভিতের ফাটল থেকে। তারও সব পাপড়ি বসে বসে ছিঁড়ল সে। আরেকটা বার করল। তখন যেন নেশায় পেয়ে বসল তাকে। একে একে সাতশ ছিয়াশিটা গোলাপ কখন সে বার করল এখানে ওখানে স্পর্শ করে আর তাদের পাপড়ি ছিঁড়ল। পায়ের কাছে পাহাড় হয়ে উঠল রক্তগোলাপের ছেঁড়া পাপড়িতে। আবার যখন হাত রাখল তখন আর গোলাপ পেল না। তখন মনে পড়ল, সাতশ ছিয়াশিটা হয়ে গেছে, আজ আর আসবে না। তখন মনে পড়ল, কেউ বিশ্বাস না করুক, কেউ তাকে ভাল না বাসুক, একজন তাকে বিশ্বাস করে, একজন তাকে

অবহেলা করেনি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল চম্পার কপালে দুলতে থাকা চাঁদের মতো একগুচ্ছ চুল। তখন সে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে সূর্যশেষের অন্ধকার। হাঁটতে লাগল ফিরদৌসি। সে ফিরে আসতে লাগল স্কুলের দিকে।

কাউকে জিগ্যেস না করে বেওকুফের মত। টিকেট ঘরের জানালা খুলে বসেছে পটকা আর চালকুমড়ো। চেহারা ভব্য করে টিকেট বেচতে শুরু করেছে। বিক্রিও হচ্ছে রমারম। দিয়ে কুলান নেই। অথচ ওদিকে সাজঘর অন্ধকার। দরোগা দিয়ে নোক ঢুকছে। এখানকার যারা বায়না করে এনেছিল তাদের লোক গেটে গেটে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে পথ দেখাচ্ছে। কেউ বলছে, দেখবেন মা বোনেরা, ওখানে একটা গর্ত আছে। এই ভাগো, ভাগো হিয়াসে। দরোজায় খিল দিয়েছে চম্পা। আর খুলছে না। জহির আর সামাদ ডেকে ডেকে সারা হল, সাড়া পেল না। গলা তুলতে পারল না, দরোজা ভাঙতে পারল না, পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়।

আর প্রফেসর সেই দুপুর থেকে শুয়ে কাঁদছেন, কাউকে চোখেও দেখছেন না। কথা বলবার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। চম্পা তার মুখের ওপর বলেছে, না, এ বিয়ে আমি চাই না।

চম্পা।

না, না, না।

সেই মুহূর্তে যেন প্রফেসর চম্পাকে নতুন করে দেখেছিলেন। মিস চম্পা–প্রাচ্যের সেরা রূপসী–যার অঙুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হয়–সে নয়; তাঁর মেয়ে চম্পা। তখন বড় ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। এক পাক গ্লানিতে ডুবে গেলেন তিনি। অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চম্পা চলে গেল পাশের ঘরে, দৃপ্ত পা ফেলে। গালে তার পাঁচটা আঙুলের ছাপ নীল হয়ে ফুটে রয়েছে তখনো।

ফিরদৌসি! বিদ্যুতের মতো তার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রফেসর নাজিম পাশার প্রফেসর জে.সি. দত্ত–র সাকরেদ মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন ভূইয়া যিনি বারো বছর আগে নিজে এই দল করেছিলেন, তাঁর। চমকে উঠলেন তিনি। যেন সরে গেল স্টেজের উপর থেকে কালো পর্দা। দেখতে পেলেন নিজেকে, জহিরকে, চম্পাকে। ফিরদৌসি আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা ছিল গোপন, সে এলো আর তা বেরিয়ে পড়ল– এক অপরিসীম ক্ষুধা, গ্লানি আর করুণার চিত্র, অন্ধকারে নৃত্যপর কংকাল আর উড়ন্ত রৌপ্যমুদ্রা। সে এক নির্মম আগন্তুক, ফিরদৌসি। হাতে তার রক্তগোলাপ।

বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন প্রফেসর। যোগ্য মনে হল না নিজেকে যে চম্পাকে ডাকবেন, সাহস হল না জহিরকে সামনা করবেন, ভয় হল খুঁজতে গিয়ে ফিরদৌসিকে যদি আর না পাওয়া যায়।

প্রফেসরকে ডাকতে যাচ্ছিল জহির, এমন সময় যারা বায়না করে এনেছিল তাদের একজন পাকড়াও করল তাকে। কী আপনাদের দেরি কিসের? সাতটা কখন বাজে। পাবলিক আর বসে থাকতে চাইছে না।

জহির কোন রকমে উত্তর দিল, এই এক মিনিট। লোকটা চলে গেলে দৌড়ে। সে প্রফেসরকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল– ওস্তাদ, শো–র টাইম হয়ে গেছে। চম্পা দরোজা খুলছে

। টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। ওস্তাদ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জহির। প্রফেসর অস্পষ্টভাবে একটা হাত নাড়লেন। জহির আবার তাকে ধাক্কা দিল, ডাকল, ওস্তাদ। পাবলিক বসে আছে। আধঘণ্টা হয়ে গেছে। প্রফেসরের হাতখানা অসাড় হয়ে পড়ে গেল বিছানায়।

ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি শো–র শুরুতে বাজাবার জন্যে একটা গৎ জানতো মিনিট পনেরোর। সেটা দুবার বাজাল। তবু যখন পর্দা উঠল না তখন ঘাম ছুটল তাদের সারা শরীরে। পর্দার এক পাশে দর্শকদের দিকে আড় হয়ে তারা বসেছিল। তাদের ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখে তারা ঘনঘন তাকাতে লাগল পর্দার দিকে আর ঢোক গিলল। গৎটা যখন দুবার বাজানো হয়ে গেল, থামল, তখন এক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল। সবাই ভাবল বাজনার এই বিরতি বোধহয় পর্দা ওঠার ইঙ্গিত। কিন্তু তা যখন হল না, তখন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে উঠল তারস্বরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব্যাপাটির চারমূর্তি কংকাল–নৃত্যের সঙ্গে বাজাবার গণ্টা শুরু করে দিল চড়া পর্দায়।

তখন হঠাৎ পর্দা উঠল। লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারল না। ব্যাপাটির চারমূর্তি অবাক হয়ে গেল শো–এর শুরুতে প্রফেসরের বদলে জহিরকে দেখে।

তার মুখে পায়রার আঁচলের দাগগুলো পাউডারেও ঢাকে নি। এক অজানা ভয়ে ভেতরটা হিম হয়ে গলে চারমূর্তির, কিছু বুঝতে না পেরে আচমকা বাজনা থামিয়ে দিল তারা।

জহির এগিয়ে এলো না। স্টেজের প্রায় পেছন পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কী বলল শুনতে পেল কেউ এক বর্ণ। চেঁচিয়ে উঠল সবাই–লাউডার প্লিজ, লাউডার প্লিজ। সেই সঙ্গে একটা তীক্ষ শিষও শোনা গেল।

দুপা এগিয়ে এলো জহির। ভদ্র মহিলা ও দ্র মহোদয়গণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আপনাদের প্রিয় আর্টিস্ট মিস চম্পা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ শো দেখানো সম্ভব হবে না। দ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ দড়াম করে এক পাটি জুতো এসে পড়ল স্টেজের ওপর। যেন কিছুই হয়নি, জহির আবার শুরু করল, গলা চড়িয়ে, ভদ্র মহিলা–এবার সাইকেলের আধাখানা টায়ার আর ইটের আস্ত একথান এসে পড়ল স্টেজে। এ এক অদ্ভুত জনতা। এরা কথা বলে না। এরা হাতের কাছে যা পায় ছেড়ে, শিষ দেয়, বাচ্চারা কাঁদে। এরি মধ্যে মেয়েদের অভিভাবকেরা মেয়ে সামলাবার জন্যে চারদিকে ওঠবোস করতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ বেরিয়ে আসছেন।

গোলাপের গন্ধ পেল চম্পা। চঞ্চল হয়ে অন্ধকার ঘরে সে উঠে বসল। কোথায় সে? ঠিক সেই সুগন্ধ। সারা ঘর ম ম করছে। উঠে দাঁড়াল চম্পা। সারা দিনের অনাহার পাক দিয়ে উঠল পেটের ভেতরে। মাথাটা বালিশে বেখে শুয়ে পড়তে হল। তখন আর কোন বোধশক্তিও রইল না। শুধু মনে হল, মাথার মধ্যে রামধনুর মতো একটা রঙিন জাঁতা ঘুরছে।

স্টেজে দাঁড়িয়ে জহির আরেকবার চিৎকার করে বোঝাতে যাবে, এমন সময় দেখল, পাশে ফিরদৌসি এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে তার শো-এর পোশাক, চুল আঁচড়ানো, জ্বলজ্বল করছে মুখ। আচমকা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল জহিরের। খপ্ করে ফিরদৌসির হাত ধরে সে দ্রুত স্খলিত কণ্ঠে বলল, গোলাপের খেলাটা শুরু করে। এরা মানছে না!

হলের ভেতরে আরো কয়েকখানা ইট এসে গিয়েছিল, যারা এনেছিল নিঃশব্দে পায়ের কাছে লুকিয়ে ফেলল। কয়েকজন আঙুল তুলে বলাবলি করতে লাগল ফিসফিস করে, ঐ যে, ঐ লোকটা ঐ যে পরে এলো, বাম দিকে। একটা বাচ্চা তখনও কাঁদছিল, সেও থেমে গেল, মা-র দুধ আবার মিঠে মনে হল তার।

তাকে কোন কথা বলতে না দেখে জহির চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল- ফিরদৌসি! যাও, সামনে যাও! হ্যাঁ করে থেকো না। বলতে বলতে সে ঠেলে দিল তাকে সামনে।

লোকেরা তখন নড়ে বসল। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, আমাদের গোলাপ দেবে।

এক মুহূর্তে ফিরদৌসির মনে পড়ল সব। কুড়িগ্রামে সেই বৃষ্টির সন্ধ্যে, চম্পার সঙ্গে রাত, প্রফেসরের তিরস্কার। বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পেল নিজেকে। তাকে বেছে নিতে হবে। এখন। এই মুহূর্তে। হলের অন্ধকার ছাদে সে দেখতে পেল রক্তগোলাপের

চিত্র। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল তার। কেউ বিশ্বাস করবে না, চম্পা। চম্পা, পালাতে নেই। ছিঃ।

আজকের সাতশ ছিয়াশিটা গোলাপ সে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তবু সে আবার একাগ্র করে আনল তার সমস্ত বিক্ষিপ্ত মন। বিড়বিড় করে বলল, আছে, আছে, আসবে, আমি আনতে পারবো, আজ আরেকবার আমাকে দাও। দর্শকদের দিকে তাকাল সে পূর্ণ দুচোখ মেলে। অপলক তাকিয়ে আছে তারা। প্রত্যাশায় তাদের চোখ কোমল হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন শোনা যাচ্ছে হৃৎস্পন্দন–আমি সবাইকে দেবো। কেউ শূন্য হাতে ফিরে যাবে না। কেউ বিশ্বাস না করুক, আমার কি তাতে এসে যাবে? ওদের হাতে, প্রত্যেকের বাড়ি নিয়ে যাওয়া গোলাপের সাথে, আমি প্রত্যেকের বাড়ি যাই। দর্শকের ওপর থেকে তার চোখ ফিরিয়ে আনল সে। জহিরকে বলল, শো বন্ধ থাকবে না। রোজ যেমন যে আইটেম দিয়ে শুরু হয়, তেমনি হবে।

শান্ত স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অধীর দর্শকের সামনে এগিয়ে এলো ফিরদৌসি। মেঘের মতো সুদূর গম্ভীর কণ্ঠে সে ঘোষণা করল, আমার ভাই–বোনেরা, হতাশ হবেন না। বহুদূর থেকে এসেছেন আপনারা আশা নিয়ে, শো হবে।

করতালিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল হল।

অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মধ্যে প্রফেসর যেন শুনতে পাচ্ছেন দর্শকের করতালি, প্রতীক্ষা, আবার করতালি, ব্যাণ্ডের আওয়াজ। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শো হচ্ছে। ঐতো ওরা

আনন্দে আবার করতালি দিয়ে উঠল। ঐ, ঐতো। উঠে দাঁড়িয়ে চম্পার কামরায় এলেন। অবাক হলেন দরোজা বন্ধ দেখে। তা হলে চম্পা স্টেজে যায়নি। কিন্তু এইমাত্র তিনি যে শুনতে পেলেন সেই বাজনা, যে বাজনা বাজে চম্পা যখন বোর্ডে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় আর তিরিশটা ছোরা হাতে জহির একের পর এক ছুঁড়তে থাকে। ঐতো সে বাজনা শুরু হল। চম্পা, চম্পা। পাগলের মতো প্রফেসর স্টেজের দিকে ছুটলেন। কিন্তু প্রত্যেকটা দরোজায় এতো ভিড় ঢুকতে পারলেন না। সবাই বিরক্ত হয়ে তাঁকে কনুই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল। কেউ ফিরেও তাকাল না তার দিকে। কেউ চিনতে পারল না। তখন পেছনের দরোজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করলেন। সে দরোজাও বন্ধ। দমাদম আঘাত করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু শোনা গেল না। প্রবল বাজনার অতলে তলিয়ে গেল প্রফেসর নাজিম পাশার করাঘাত। আজ তিনি বাইরে। তাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে। আজ আর ঢুকতে পারবেন না তিনি। কোন দরোজা খোলা নেই তার জন্যে।

বোর্ডে পিঠ ঠেকিয়ে ফিরদৌসি হাসল। হাসল না তো যেন একখণ্ড স্মিত বিদ্যুত স্থির হয়ে রইল তার ঠোঁটে। আধখানা বৃত্ত আঁকল ডান হাত দিয়ে জহির তার পেছনে, তারপর বৃত্তটাকে চোখের পলকে প্রসারিত করে দিল সমুখে, সরল রেখায়।

থরথর করে সারা হলে ফেটে পড়ল গোলাপের সুগন্ধ। এক পশলা গোলাপে ভরে গেল সামনের সারি। করতালি আর উল্লাসে বধির হয়ে গেল শ্রবণ। প্রথমে বিহ্বল পরে নিজের কৃতিত্বেই মুগ্ধ হয়ে গেল জহির। দ্রুত সে দ্বিতীয়টি হাতে নিল। নেশার মতো এক সব-বোধ অন্ধ করা অনুভূতিতে মাতাল হয়ে উঠল তার হাত।

দরোজার খিল খুলে ফেলল চম্পা। এতক্ষণ তার ঘরে যে সুগন্ধ ছিল গোলাপের, হঠাৎ এক বাতাসের দমকে যেন তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কী হল? এতো করতালি কেন?

সারা হলে তখন পশলার পর পশলা গোলাপের বৃষ্টি হচ্ছে। ফোয়ারা থেকে শীকরের মতো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে গোলাপ, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে সুগন্ধ। ভারি হয়ে আসছে বাতাস। এক আশ্চর্য যাদুর সন্ধান পেয়ে লোকের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে অভিনন্দন।

সাতাশ–আটাশ–উনত্রিশ–ত্রিরিশ–শেষ ছোরাটা জহিরের হাত থেকে যখন উড়ে গেল তখন গোলাপ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না সারা হলে। যেন গোলাপের ঝড় উঠেছে।

রাশি রাশি গোলাপ উড়ছে, ছিটকে পড়ছে ডুবিয়ে দিচ্ছে–গোলাপ আর গোলাপ। এমনকি সারা স্টেজেও আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু অগণিত গোলাপের রঙ আর সুগন্ধ।

সমুদ্র জলোচ্ছাসের মতো করতালির মধ্যে নেমে এলো পর্দা। দৃশ্য আড়ালে চলে গেল, আর দেখা গেল না, তবু সে করতালি থামল না। থামল না সপ্তমে ওঠা ব্যাণ্ডপার্টির সুর। থামল না প্রফেসরের অবিশ্রান্ত করাঘাত। চম্পা জানতেও পারল না সাতশ ছিয়াশিটা গোলাপ ফুরিয়ে গেলেও ফিরদৌসি আজ আবার গোলাপ আনতে পেরেছে।

পর্দার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে ফিরদৌসি আস্তে আস্তে বসে পড়ল তার পায়ের ওপর, যেন সিজদা দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ দ্রুততা এলো তার ভঙ্গিতে, যেন এক মুহূর্ত সময় আর

নেই। গোড়ালির ওপর বসবার আগেই মাথা নত হয়ে এলো তার। সেখানে নিজের রক্তের স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রক্তগোলাপের যাদুকর ফিরদৌসির প্রাণহীন দেহ।

মাউরেণ্ডার রেস্তোরাঁ, ঢাকা
রচনাকাল ১৯৬৩